সাইক্লোনের কবলে দস্যু বনহুর

রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

সাইক্লোনের কবলে দস্যু বনহুর-৬৮

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে থেমে গেলো ঈগল।

সোফাসহ উল্‌টে পড়তে পড়তে সামলে নিলো বনহুর নিজেকে। ভীষণ একটা শব্দ হলো পরক্ষণেই, আর্তচিৎকার এবং করুণ কান্না কানে ভেসে এলো তার। বনহুর হঠাৎ বুঝতে পেরে বেরিয়ে এলো ক্যাবিন থেকে।

ক্যাবিনের বাইরে আসতেই কে যেন পিছন থেকে তাকে জাপটে ধরলো।

বনহুর মুহূর্তে বুঝে নিলো ঈগল জলদস্যুর কবলে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে বনহুর চালালো ঘুষির পর ঘুষি। যে লোকটা বনহুরকে জাপটে ধরেছিলো সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো জাহাজের মেঝেতে।

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়াতেই আরও দু'জন এসে তাকে আক্রমণ করলো। দু'জনের হাতেই ধারালো অস্ত্র। বনহুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দু'জনকে বাধা দিলো, ধরে ফেললো জল দস্যুদের অস্ত্রসহ হাত দু'খানা। এমন বলিষ্ঠতার সঙ্গে বনহুর ওদের হাত দু'খানা ধরে ফেলেছে এক চুল নড়তে পারলোনা দস্যুদ্বয়। ওদের হাতের ছোরা দুটো খসে পড়লো জাহাজের ডেকে।

বনহুর এবার ওদের হাত মুক্ত করে দিয়ে একজনকে তুলে নিয়ে নিক্ষেপ করলো সাগর বক্ষে। পরক্ষণেই আর একজন পাল্‌টা আক্রমণ করলো বনহুরকে, বনহুর তাকেও তুলে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলো সাগরের জলে।

প্রবল জলরাশির অতলে তলিয়ে গেলো লোক দু'টো।

বনহুর যেমন ফিরে তাকাবে। অমনি এক সঙ্গে দশ বারো জন আক্রমণ করলো বনহুরকে ভীষণভাবে।

তখন সমস্ত জাহাজময় একটা আর্তচিৎকারে ভরে উঠেছে। বনহুর দশ বারো জন দস্যুর সঙ্গে সমানভাবে লড়াই করে চললো। কৌশলে সে একজনের হাত থেকে একটি ছোরা কেড়ে নিয়েছিলো। কয়েকজন জলদস্যুকে বনহুর নিহত করলো।

কিন্তু সে একা আর জলদস্যুর সংখ্যা ছিলো প্রায় একশত জনের বেশি। সকলের হাতেই ছিলো অস্ত্র।

বনহুরকে ওরা এক সময় গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলো।

একজন বনহুরের বুকে একটি সূতীক্ষ্ণ ছোরা বসিয়ে দিতে যাচ্ছিলো।

সঙ্গে সঙ্গে একজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক বলে উঠে—থামো।

ছোরা সহ হাতখানা থেমে যায়।

বলিষ্ঠ চেহারার লোকটা আদেশ দেয় ওকে বেঁধে ফেলো।

বনহুরকে দশ বারো জন লোক রশি দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে ফেলে। বনহুর অগত্যা নিশ্চুপ থাকতে বাধ্য হলো।

সমস্ত জাহাজখানায় জলদস্যুরা চালালো লুটতরাজ। হত্যা করলো ওরা অনেককে। বন্দী করে নিলো কিছু সংখ্যক লোককে। বনহুরকেও ওরা বন্দী করে নিয়ে চললো অপর একটি জাহাজে।

কয়েকটি তরুণীকেও জলদস্যুরা জোরপূর্বক ধরে নিয়ে চললো।

কিছু সময়ের মধ্যে ঈগলের বুকে ঘটে গেলো এক বীভৎস কান্ড। কতকগুলো রক্তাক্ত দেহ ছড়িয়ে রইলো বিক্ষিপ্তভাবে ঈগলের সর্বত্র।

করুণ কান্না আর আর্তনাদে ভরে উঠেছে চারদিক।

ঈগলের বুক থেকে জলদস্যুরা মাল নিয়ে তাদের জাহাজে পার হয়ে যাচ্ছে। একটা বড় আকারের তক্তা এ জাহাজ থেকে ও জাহাজে সাঁকোর মত করে রাখা হয়েছিলো। বনহুরকে ওরা রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলে এ তক্তাখানার উপর দিয়ে।

জলদস্যুদের জাহাজখানা ও আকারে বেশ বড়। বনহুরকে জলদস্যুরা এনে একটি ক্যাবিনে আটক করে রাখলো।

যে ক্যাবিনে বনহুরকে বন্দী করে রাখা হলো সেই ক্যাবিনের পাশেই ছিলো জলদস্যুদের দলপতির ক্যাবিন। বনহুর পাশের ক্যাবিন থেকে শুনতে পাচ্ছিলো সেই কণ্ঠস্বর, যে কণ্ঠস্বর বলে ছিলো, 'থামো ওর বুকে ছোরা বসিয়ে দিও না'। আমার বোঝাপড়া আছে ওর সঙ্গে।

বনহুর শুনতে পেলো সেই কণ্ঠে জাহাজ ছাড়ার আদেশ।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত জাহাজখানা দুলে উঠলো।

ঝক্ ঝক্ ঝক্......

একটানা অদ্ভুত শব্দ করে জাহাজখানা চলতে শুরু করলো। বনহুর বন্ধ ক্যাবিনের মেঝেতে বসে ভাবছে এ অবস্থার শেষ কি এবং কোথায় কে জানে। তার হাত দু'খানা মোটা রশি দিয়ে পিছ মোড়া করে বাঁধা, সমস্ত শরীরে রশি জড়ানো।

বনহুরের কপালে এক জায়গায় একটি ক্ষত দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো। জামার কয়েক স্থানে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। জামাটা ছিড়েও গেছে কয়েক স্থানে।

জাহাজখানা এখন কোন দিকে কোথায় চলেছে সে জানে না। তবু বুঝতে পারে এবার জাহাজখানা তাদের ঘাঁটি অভিমুখে চলেছে। বনহুর বেরিয়েছিলো জিহাংহা থেকে সোজা সে ফিরে আসবে আস্তানায়। কতদিন সে নিজের অনুচরদের থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে। রহমান কি ভাবে তার অনুপস্থিতিতে কাজ করছে—তবে বনহুরের ভরসা আছে, রহমান আস্তানায় থাকলে তার অভাব তেমন করে অনুচররা বুঝতে পারে না। কাজ কর্ম ঠিকভাবেই সমাধা হয়ে থাকে। তবু মাঝে মাঝে আস্তানার জন্য মন অস্থির হয় বনহুরের, কত দিন নূরীকে সে পাশে পায়নি। কতদিন মনিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেনি। নূরীর জন্য বেশি চিন্তা হয় না কারণ নূরী জানে এবং বোঝে বনহুর অকারণে আস্তানা ছেড়ে কোথাও থাকে না। মনিরা বড় অভিমানিনী, তাকে নিয়ে বেশি ভাবনা বনহুরের, ফিরে এলে কিছুতেই সে তাকে স্বাভাবিক মনে গ্রহণ করবে না। কত মান অভিমান চলবে, কত অনুরোধ কত কাতর মিনতির পর হয়তো কথা বলবে সে। নূরের কৈফিয়ৎ তো রয়েছেই, এখন সে বেশ বড় হয়েছে বুঝতে শিখেছে। কেন তার আব্বু বাড়ি থাকে না, কোথায় থাকে, কোথায় যায় এসব চিন্তা তার মনে প্রশ্ন জাগায়। জাবেদ এখনও বাচ্চা তবু সে তার মাকে প্রশ্ন করে—আব্বু কোথায় যায়। নূরী নানা কথা বলে তাকে ভুলিয়ে রাখে। সবচেয়ে মায়ের মুখখানা বনহুরের বেশি করে মনে হয়, পিতা নেই একমাত্র মা-ই তার শ্রদ্ধেয়া......

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, পাশের কেবিন থেকে ভেসে আসে নারী কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ—বাঁচাও, বাঁচাও, না না আমাকে তুমি স্পর্শ করোনা...ছেড়ে দাও নরপশু আমাকে তুমি ছেড়ে দাও......

বিকট অট্টহাসির আওয়াজ তলিয়ে দেয় করুণ নারীকণ্ঠটিকে। মনে পড়ে হামবার্টের কবলে হুংমার করুণ আর্তনাদের কথা। বনহুরের সমস্ত দেহ সজাগ হয়ে উঠে। শিরায় শিরায় উষ্ণ হয়ে উঠে তার রক্তধারা। ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে আসে। মুষ্ঠিবদ্ধ হয় তার দক্ষিণ হাত খানা। বুঝতে পারে জলদস্যু সর্দার কোন বন্দী নারীর উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। না জানি কে সে রানী কার স্ত্রী নতুবা বোন বা কন্যা কে জানে।

পুনরায় আর্তকণ্ঠস্বর—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও...শয়তান...উঃ, মা...মা বাঁচাও...বাঁচাও...

বনহুর উঠে দাঁড়ায়, যদিও তার হাত পিছমোড়া করে বাঁধা তবু সে ক্যাবিনের দরজায় পা দিয়ে প্রচণ্ড লাথি দেয়। একবার, দু'বার, তিন বার, সঙ্গে সঙ্গে দরজা ভেংগে যায়। বনহুর দ্রুত প্রবেশ করে পাশের ক্যাবিনে।

ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই দেখতে পায় জলদস্যু সর্দার একটি বিশ বাইশ বছর বয়স্ক তরুণীকে মেঝেতে ফেলে তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে। তরুণী প্রায় বিবস্ত্র, এলামেলো চুল। চোখে মুখে ভীত আতঙ্কিত ভাব। প্রাণপণ চেষ্টায় সে নিজকে জলদস্যুর কবল থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে চলেছে।

বনহুর ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই জলদস্যু সর্দার তরুণীকে মুক্ত করে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। দাঁতে দাঁত পিষে বললো সে—কি করে ক্যাবিন থেকে বের হলে?

শয়তান, যেমন করে মানুষ বের হয় তেমনি করে। খবরদার ঐ মেয়েটির শরীরে হাত দিও না। বনহুর কথাগুলো বলে তাকালো তরুণীর দিকে।

তরুণী তার ভুলুণ্ঠিত বস্ত্রখানা তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে অর্দ্ধ উলঙ্গ শরীরখানায় জড়িয়ে নিচ্ছিলো।

জলদস্যু সর্দার হুঙ্কার ছাড়লো—কোরা-ম্যাধা-বাঘা তোমরা কোথায়?

একসঙ্গে তিনজন জলদস্যু প্রবেশ করলো সেই ক্যাবিনে। বন্দীকে সেই ক্যাবিনে দেখে ওরা অবাক হলো, ঢোক গিলে বললো একজন —ওস্তাদ......

তোমরা কোথায় ছিলে? বন্দী কি করে বের হলো তার ক্যাবিন থেকে। জলদস্যু সর্দার গর্জন করে বললো।

মাথা চুলকালো ওরা সবাই।

মুখ চাওয়া-চাওয়ী করে একজন বললো—ওস্তাদ আমরা ঠিকমত আমাদের ডিউটি করছিলাম, বন্দী কেমন করে বের হলো জানিনা।

হুঙ্কার ছাড়লো—নিয়ে যাও এবার ভাল করে আটকে রাখো। যাও......

এরা তিনজন একসঙ্গে বনহুরকে ধরতে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর পা দিয়ে আঘাত করলো এক জনকে।

লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতেই তার আঘাতে অপর দুজন পড়ে গেলো।

বনহুর বললো—জলদস্যু সর্দার সাবধান ওর দেহ তুমি স্পর্শ করোনা......

বনহুরের কথায় অট্টহাসি হেসে উঠলো জলদস্যু সর্দার।

ততক্ষণে ওরা তিনজন বনহুরকে পাকড়াও করে ফেলেছে।

বনহুর কোন প্রতিবাদ করলো না এবার। সে নীরবে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় একবার অসহায় তরুণীটির দিকে তাকিয়ে দেখলো।

তরুণী দু'চোখে বিস্ময় আর কৃতজ্ঞতা নিয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে। বনহুরকে ওরা বের করে নিয়ে যেতেই তরুণী ছুটে এলো, বনহুরের পিছনে পিছনে সে বেরিয়ে যাবে সেই ক্যাবিন থেকে কিন্তু তার পূর্বেই জলদস্যু সর্দার ধরে ফেললো তরুণীটিকে। যেমন ব্যাঘ্র হরিণ শিশুকে এক থাবায় টেনে নেয় তেমনি করে জল দস্যু সর্দার তরুণীটিকে টেনে নিলো নিজের কাছে।

বনহুরকে ওরা নিয়ে যাচ্ছিলো তার ক্যাবিনে আটকে রাখার জন্য। বনহুরের কানে এলো তরুণীর করুণ চিৎকার। বনহুর মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো, ইচ্ছা করলে সে এই বন্ধন অবস্থাতেও তিন জনকে কাবু করতে পারে কিন্তু সে ইচ্ছা করেই চুপ করে রইলো।

বনহুরকে ওরা বন্দী করে রাখলো মজবুত করে তারপর বেরিয়ে গেলো। দু'জন পাহারা রইলো ক্যাবিনের দরজার দু'পাশে।

বনহুরের কানে এলো করুণ আর্তনাদ।

দাঁতে দাঁত পিষলো বনহুর। সে বুঝতে পারলো তরণীকে রক্ষা করা সম্ভব হলোনা। হতাশ হয়ে বসে পড়লো বনহুর মেঝেতে।

জলদস্যু সর্দারের ক্যাবিন থেকে নারী কণ্ঠের একটা গোঙ্গানীর শব্দ কানে ভেসে আসে বনহুরের।

❑

গভীর রাতে বনহুরের তন্দ্রার মত এসেছিলো হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে যায়। বনহুরের কানে আসে ঝুমুরের শব্দ। জলদস্যু সর্দারের ক্যাবিন থেকেই শব্দটা আসছে তার সঙ্গে জড়িত কণ্ঠস্বর—নাচো আরও নাচো...

অপর একটি কণ্ঠ—বহুৎ খুব সুরৎ ন্যচ। ওস্তাদ সুরমা বাই এতো ভাল নাচতে পারে আগে জানা ছিলোনা। ওর নাচ বহুৎ দেখেছি কিন্তু আজ এতো সুন্দর নাচছে......

সর্দারের কণ্ঠস্বর—আজ সুরমার মোটা বখশীস মিলেছে তাই... আরও বখশীস মিলবে।

'ওস্তাদ নতুন মেয়েটিকে সুরমা নাচ শেখাবে।

হাঁ ঠিক কথা বলেছো সোরাব হোসেন। নতুন মেয়েটাকে নাচ শিখাতে হবে। কথার ফাঁকে শোনা গেলো জল দস্যু সর্দারের কণ্ঠস্বর।

নূপুর ধ্বনি থামলো সঙ্গে সঙ্গে কর ধ্বনি শোনা গেলো তার সঙ্গে শোনা গেলো নারী কণ্ঠের খিল-খিল হাসির আওয়াজ।

ওরা সারাব পান করেছে এবং নর্তকি বা নাচনে ওয়ালীকে নিয়ে আমোদ প্রমোদে মেতে উঠেছে! জাহাজ চলার একটানা শব্দও ভেসে আসছে তার কানে।

বনহুর শুনতে পেলো জলদস্যু সর্দারের জড়িত কণ্ঠস্বর—যাও এবার তোমরা আরাম করো গে তার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলো টেবিলে গেলাস রাখার শব্দ।

হয়তো বা সারাবের গেলাস রেখে উঠে দাঁড়ালো জলদস্যু সর্দার।

বনহুর ক্যাবিনের দেয়ালে ঠেশ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো একটু তবে একেবারে ঘুম নয় তন্দ্রাচ্ছন্ন বলা চলে। হাত দু'খানা পিছ মোড়া অবস্থায় বাঁধা থাকায় বনহুরের বেশ কষ্ট হচ্ছিলো তাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে এ

সব কষ্ট সহ্য করার মত অভ্যাস তার ছিলো—তাই সে বেশি কাতর হয়ে পড়েনি।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো সে ক্যাবিনের এক পাশে। যেদিক থেকে পাশের ক্যাবিনের কথাগুলো ভেসে আসছিলো। বনহুর তাকালো সম্মুখের শার্শীর ফাঁক দিয়ে ওপাশে। যে দৃশ্য তার নজরে পড়লো তা অতি ঘৃণ্য, বনহুর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো।

বনহুর কিছুক্ষণ ভাবলো কেমন করে এই জলদস্যুদের কাবু করা যায়। কেমন করে এদের সে শায়েস্তা করবে। সেই তরুণীর করুণ মুখখানা ভেসে উঠে বনহুরের চোখের সামনে। অসহায় তরুণী কিছুতেই নিজেকে রক্ষা করতে পারলোনা শয়তান জলদস্যু সর্দারের কবল থেকে। নিশ্চয়ই ঐ তরুণীটিকে জাহাজ ঈগল থেকে ধরে আনা হয়েছে। হয়তো বা হত্যা করা হয়েছে ওর পিতামাতা বা স্বামীকে তারপর ওকে নিয়ে এসে তার উপর চালাচ্ছে পাশবিক নির্যাতন। সেদিন ঈগলের হামলার কথা মনে করে বনহুরের ধমনির রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠে। বনহুর পায়চারী করে চলে ক্ষিপ্রভাবে। হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে যায় ওপাশে একটা ধারালো লম্বাটে বস্তুর উপর। জিনিসটা একটা ত্রিফলা আকারের অস্ত্র।

বনহুরের সুন্দর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠে একটা প্রসন্নতার ছাপ। বনহুর ত্রিফলা আকারের অস্ত্রটা দিয়ে ক্যাবিনের দেয়ালে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেয় তারপর পিছন ফিরে বন্ধন মুক্ত হাত দু'খানা ঘষতে থাকে ধীরে ধীরে।

মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাত দু'খানা মুক্ত হয়ে যায় বনহুরের। সে এবার নিজের দেহ থেকে দড়িগুলো খুলে ফেলে দেয় এক পাশে। বনহুর এবার এগিয়ে যায় সেই শার্শীর পাশে। পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বনহুর পাশের ক্যাবিনে। এখনও ক্যাবিনে কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। ভালভাবে তাকাতেই দেখতে পায় জলদস্যু সর্দার চীৎ হয়ে পড়ে আছে তার শয্যায়। পাশে কয়েকটা বোতল এবং কাঁচ পাত্র।

সারাব পার্ন করে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। নাসিকা ধ্বনি হচ্ছে রীতিমত। বনহুর ক্ষীপ্রতার সঙ্গে কাঁচের শার্শীর কপাটগুলো কৌশলে খুলে ফেলে। তারপর সতর্কতার সঙ্গে প্রবেশ করে সেই ক্যাবিনে।

বনহুর জলদস্যুর বিছানার পাশে এগুতেই নজরে পড়ে দুটো ঝুমুর বিছানার উপরে ছড়িয়ে আছে। হয়তো বা নর্তকীর চরণের নুপুর এ দুটো। এতোক্ষণ নর্তকীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত ছিলো তারপর নর্তকী বিদায় নিয়েছে। জলদস্যু গভীর নিদ্রায় মগ্ন এখন।

বনহুর নিদ্রিত জলদস্যুর মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দু'হাত দিয়ে আচম্বিতে চেপে ধরলো জলদস্যুর কণ্ঠনালী। বিছানায় উঠে বসে ভীষণ জোরে চাপ দিলো বনহুর ওর গলায়।

জলদস্যু জেগে উঠবার আগেই তার মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো লাল টক্ টকে রক্ত। একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ বের হলো তার গলা দিয়ে।

বনহুর আগেই ক্যাবিনের দরজা আটকে দিয়েছিলো।

সর্দারের ক্যাবিনে গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনে ছুটে এলো কয়েকজন অনুচর। ক্যাবিনের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলো—ওস্তাদ...ওস্তাদ... কি হয়েছে...ওস্তাদ...

ততক্ষণে বনহুর জলদস্যু সর্দারকে একেবারে ঠান্ডা করে দিয়েছে। একে সে অতিরিক্ত নেশা পান করেছিলো তারপর গভীর ঘুমে অচেতন ছিলো কাজেই দস্যু সর্দার অতি সহজেই পরপারে যাত্রা করলেন। বনহুর নিজের কণ্ঠস্বরকে ঠিক জলদস্যু সর্দারের মত করে নিয়ে জবাব দিলো—তোমরা যাও ঘুমাও গে! আমার নেশাটা একটু বেশি হয়ে গেছে তাই গলাটা কেমন গোঁ গোঁ করছে......তোমরা চলে যাও আমাকে বিরক্ত করতে এসো না।

আচ্ছা ওস্তাদ আমরা যাচ্ছি।

জলদস্যুগণ ওস্তাদের কথা শুনে চলে গেলো যে যার বিশ্রাম ক্যাবিনে।

বনহুর তাড়াতাড়ি সর্দারের শরীর থেকে তার ড্রেস খুলে নিলো। তারপর পরে নিলো সে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। হঠাৎ যদি কেউ এসে পুনরায় ডাকাডাকি শুরু করে সে জন্যই বনহুর দ্রুত হস্তে কাজ করছিলো। নিজের দেহের পোশাকটা খুলে নিয়েছিলো সে আগেই। এবার বনহুর তার পোশাকটা জলদস্যু সর্দারের দেহে কোন রকমে পরিয়ে দিলো। বিছানায় গড়িয়ে পড়া রক্তগুলো দু'হাতে মাখিয়ে জলদস্যুর মুখখানা একেবারে অচেনা করে ফেললো।

বনহুর এবার ক্যাবিনের দরজা খুলে ফেললো।

দরজা খুলবার আগে বনহুর জলদস্যু সর্দারের পোশাক পরে নিজের চেহারাটা একবার আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে দেখে নিলো। হাঁ তাকে প্রায় জলদস্যু সর্দারের মতই মনে হচ্ছে। তবে পোশাকটা একটু ঢিলা হচ্ছে তার শরীরে এই যা। একটা ছুরি নিয়ে আঠা দিয়ে আটকে নিলো ঠিক সর্দারের গোঁফ যেমন ছিলো তেমন করে। সর্দারের ক্যাবিনে বিরাট একখানা আয়না ছিলো এবং আয়নার পাশে কতকগুলো কাগজকলম এবং আঠার পট ছিলো যার জন্য বনহুরের ছদ্মবেশ ধারণ তেমন কোন অসুবিধা হয় না।

বনহুর দরজা খুলে হাতে তালি দিলো যেমন করে জলদস্যু সর্দার দিতো।

সঙ্গে সঙ্গে জলদস্যু অনুচরগণ ছুটে এলো। জাহাজের ডেকে তখন জমাট অন্ধকার। সবাই এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একজন বললো—ওস্তাদ কোন জাহাজ দেখা গেছে কি?

বনহুর গম্ভীর গলায় বললো—না।

তবে কি হুকুম ওস্তাদ?

ওকে খতম করেছি। বন্দীটা আমার ক্যাবিনে প্রবেশ করে আমাকে আক্রমণ করেছিলো। যাও আমার বিছানায় শুয়ে আছে নিয়ে এসে সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করো।

এক সঙ্গে সবাই ক্যাবিনে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো।

বনহুর বলে—থামো।

ওস্তাদ আপনি বললেন বন্দীকে আপনার বিছানায় হত্যা করে রেখেছেন?

হ্যাঁ রেখেছি। তবে সবাই নয় দু'জন গিয়ে ওর লাশটা তুলে নিয়ে এসো এবং সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করো।

সর্দারের আদেশ অমান্য করার সাহস তাদের ছিলো না। সবাই ক্যাবিনে প্রবেশ না করে দু'জন বলিষ্ঠ জোয়ান ক্যাবিনে প্রবেশ করে তুলে নিয়ে এলো লাশটা।

জাহাজের ডেকে তখন অন্ধকার।

লোক দু'জন যখন লাশটা ধরাধরি করে ডেকে নিয়ে এলো তখন ঠিক মনে হচ্ছিলো এটা সেই লোক। যাকে তারা পাশের ক্যাবিনে আটক করে রেখেছিলো। কারণ অন্ধকারে পোশাকটাই হলো চিহ্নস্বরূপ!

লোক দু'জন নিজেদের সর্দারের শবদেহ নিঃশব্দে সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করে হর্ষধ্বনি করে উঠলো।

বনহুর বললো—যাও তোমাদের কাজ এখন শেষ হয়েছে। আমি ঘুমাবো বিছানা পাল্টে দিয়ে যাও।

দু'জন অনুচর রক্ত মাখা বিছানাখানা পরিষ্কার করে দিয়ে চলে যায়।

সবাই চলে যায়!

বনহুর জলদস্যু সর্দারের বিছানায় শুয়ে পড়ে।

বেশ কিছুক্ষণ ঘুম তার চোখে আসেনা। ভোর হতে না হতেই তাকে জলদস্যু সর্দারের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। তাই সে মনে মনে আওড়াতে থাকে সর্দারের কথার ভাবধারাগুলো।

এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে বনহুর!

❑

ক্যাবিনের দরজা খোলাই ছিলো। বনহুর ইচ্ছা করেই বন্ধ করেনি কারণ এতে জলদস্যুগণের মনে কোন সন্দেহ জাগতে পারে।

হঠাৎ নারী কণ্ঠের আহ্বানে ঘুম ভেংগে যায় বনহুরের। চোখ মেলে তাকাতেই দেখতে পায় একটি নারী তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে হাস্য দীপ্ত কণ্ঠে ডাকছে—ওস্তাদ কত ঘুমাও এবার ওঠো।

বনহুর হাই তুলে পাশ ফিরলো—আর একটু ঘুমাতে দাও। পাশ ফিরে ভাবছে বনহুর ওর নাম সে জানে না। জানেনা ওর সঙ্গে জলদস্যুর কি সম্পর্ক! হঠাৎ কোন কথা বলা উচিৎ হবে না, কাজেই নিশ্চুপ ঘুমের ভান করে রইলো।

নারীটি বললো—আজ কি তোমার ভীমরতি ধরেছে? রোজ কত সকাল সকাল উঠো। আমাকে নিয়ে কত আমোদ আহলাদ করো ......কই আমাকে পাশে টেনে নিলে না তো?

বনহুর বললো—মন ভাল নেই। এখন যাও সত্যি বডড ঘুম পাচ্ছে।

না যাবোনা। একটু পরেই অনুচরদের নিয়ে মেতে উঠবে, আজ কোনদিকে অগ্রসর হবে কি ভাবে কাজ চালাবে। আরও কত কি ও বুঝেছি সূর্যমুখি আসেনি তাই অভিমান করেছো।

বনহুর আলগোছে মনে মনে নামটা মুখস্থ করে নিলো, তাহলে আরও একজন আছে নাম তার সূর্যমুখি। কিন্তু এর নাম কি কে জানে। তবু প্রতিক্ষা করতে লাগলো বনহুর আরও কিছু জানার জন্য।

নারীটি পুনরায় বললো—বুঝেছি সূর্যমুখিকে তুমি বেশি ভালবাসো আমাকে মোটেই ভালবাসোনা। বেশ মণিমালা বিদায় নিচ্ছে.....

বনহুর বুঝলো ওর নাম মণিমালা। মনে মনে উচ্চারণ করলো বনহুর মণিমালা। হঠাৎ একটু অস্পষ্ট ভাবে নামটা ওর কানে পৌঁছে গেলো?

কি আমাকে মনে মনে গাল দিচ্ছো?

এবার বনহুর কথা না বলে পারলোনা, বললো—না না গাল দেবো কেনো মনে মনে তোমাকে স্মরণ করছি।

সত্যি?

হ্যাঁ।

তবে চলে যেতে বললে কেনো। রোজ আমি না এলো তোমার যে মন ভরেনা। আজ তুমি কেমন যেন হয়ে গেছো। কি হয়েছে তোমার বলোনা? মনিমালা পাশে বসে বনহুরের বুকে মাথা রেখে বললো আবার রাতে ঘুম হয়নি বুঝি।

বনহুর অৰ্দ্ধশায়ীত অবস্থায় উঠে বসে মনিমালার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো—হাঁ রাতে মোটেই ঘুম হয় নি মনিমালা কারণ একটা বিভ্রাট ঘটে গেছে।

বিভ্রাট! কি বিভ্রাট সর্দার?

পাশের ক্যাবিনে যে বন্দীটিকে আটকে রাখা হয়েছিলো সে আমার ক্যাবিনে শার্শী গলিয়ে প্রবেশ করে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো কিন্তু আমিই তাকে হত্যা করেছি......

লোকটাকে হত্যা করেছো সর্দার।

হাঁ আশ্চর্য ওকে হত্যা করতে গিয়ে আমি একেবারে হীমশীম খেয়ে গিয়েছিলাম।

ওর লাশ কোথায়?

সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করেছি।

যাক ভালই হলো শত্রুকে কোনদিন জিইয়ে রাখতে নেই। সর্দার?

বলো?

সূর্যমুখিকে তুমি বেশি ভালবাস না আমাকে?

এবার হাসলো বনহুর তারপর বললো—তোমাকে।

তবে আজ আমাকে এমন দূরে দূরে সরিয়ে দিচ্ছো কেনো?

বললাম তো আজ মন ভাল নেই। মনিমালা এখন যাও কেমন?

আচ্ছা যাচ্ছি কিন্তু মনে থাকে যেন সূর্যমুখিকে যদি ডেকে পাঠাও তবে দেখবে মজাটা হাঁ।

না সূর্যমুখিকে নয় তোমাকেই আবার ডাকবো।

আচ্ছা সর্দার?

বলো?

নতুন মেয়েটাকে নিয়েতো কাল খুব ফুর্তি করলে কেমন লাগলো ওকে?

ও কি বললো?

আমার কথা যেন বুঝতেই পারছোনা—সেই বন্দী মেয়েটার কথা বলছি।

মোটেই তোমাদের মত নয়।

সত্যি বলছো?

হাঁ।

তবে যে ওকে বশ করার জন্য সূর্যমুখিকে অনেক টাকা বখশীস দেবে বলেছো? সূর্যমুখি মেয়েটাকে নানাভাবে বোঝাচ্ছে। সমস্ত রাত ওরা ঘুমায়নি কত কথা বলছে সূর্যমুখি ওকে। কিন্তু মেয়েটা শুধু কাঁদছে কিছুতেই বশ মানছে না। মেয়েটা একেবারে অবুঝ।

বনহুর একটু শব্দ করলো—হুঁ বুঝেছি।

আচ্ছা সর্দার আমি যদি ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তোমার কাছে আনতে পারি আমাকে কি বখশীস দেবে?

একটু ভেবে বললো বনহুর—তোমাকে সে কাজ করতে হবে না।

ও আমাকে তুমি ঠকাতে চাও। আমি ছাড়ছি না, শোন সর্দার, আমি যদি পারি তবে আমাকেই বখশীসটা দিতে হবে কিন্তু...... কথাটা বলে বাঁকা চোখে একবার সে বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন। বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো হঠাৎ ক্যাবিনের দেয়ালে একটা বড় ফটোতে নজর পড়লো তার। দেখলো ফটোখানার নিচের অংশ কালো কাপড়ে ঢাকা—মাথায় পাগড়ী কতকটা বনহুরের নিজের পাগড়ীর মতই দেখতে। বনহুর চিনতে পারলো এটা জলদস্যু সর্দারের আর এক বেশ। ভালই হলো বনহুর সর্দারের এই বেশটাই বেছে নেবে।

ক্যাবিনের ওদিকে আর একটি ক্যাবিন আছে বলে মনে হলো বনহুরের। সে ঐ ক্যাবিনের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করতেই খুশি হলো কারণ সে দেখলো ঐ ক্যাবিনে নানা রকম পোশাক-পরিচ্ছদ এবং নানা ধরনের মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র রয়েছে।

বনহুর এক একটা ড্রেস পরে দেখে নিলো। পাগড়ী পরে পাগড়ীর আঁচল দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢেকে দেখলো। সবই ভাল তবে পোশাকগুলো একটু ঢিলা হচ্ছে। জলদস্যু সর্দার তার চেয়ে একটু মোটা ছিলো এই যা।

বনহুর ড্রেসগুলো পরীক্ষা করার পর বেরিয়ে এলো তার পূর্বের ক্যাবিনে।

ঐ মুহূর্তে একজন জলদস্যু এসে কুর্ণিশ করে দাঁড়ালো—সর্দার দূরে একটি জাহাজ দেখা যাচ্ছে চম্বুক মেশিন চালু করে দেবো কি?

যাও আমি আসছি? বনহুর অপর ক্যাবিনে প্রবেশ করে ড্রেস পাল্‌টে নেয় এবং পাগড়ী পরে পাগড়ীর আঁচল দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢেকে ফেলে তারপর পিঠে রাইফেল ঝুলিয়ে বেরিয়ে আসে যেমন সর্দারের ফটোখানায় তার পোশাক পরা রয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে।

সর্দার আসতেই জলদস্যুগণ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

একজন বললো চম্বুক মেশিনের সুইচ চালু করে দেবো সর্দার।

অপর একজন বললো—দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যাচ্ছে ওটা যাত্রীবাহী জাহাজ নয়, ওটা মালবাহী জাহাজ।

বনহুর বললো—আচ্ছা আগে আমি নিজে দেখে নেই। বনহুর দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে দেখলো। দেখে বললো, হাঁ ওটা যাত্রীবাহী জাহাজ নয় মালবাহী, কিন্তু ওতে কি মাল আছে আমরা জানিনা তবু আমরা ঐ জাহাজখানাকে পরীক্ষা করে দেখতে চাই। যাও চম্বুক মেশিনের সুইচ অন করে দাও।

সর্দারের আদেশ পাওয়া মাত্র চুম্বক মেশিনের সুইচ অন্ করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে দূরের জাহাজখানা এগিয়ে আসছে বলে মনে হলো।

এদিকে জলদস্যুগণ অস্ত্র শস্ত্র হাতে সবাই ডেকে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে দেখছে।

দূরে বহু দূরে জাহাজখানা সাঁ সাঁ করে এগিয়ে আসছে।

চুম্বক মেশিনের অদ্ভুত শক্তি!

জাহাজখানা অল্পক্ষণের মধ্যেই একেবারে নিকটবর্তী হলো।

বনহুর দূরবীক্ষণ যন্ত্রে তখনও চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজখানা একেবারে কাছাকাছি এসে গেছে। বনহুর অবাক হয়ে গেলো জাহাজে কোন লোকজন নড়াচড়া করছে বলে মনে হলোনা। আরও নিকটবর্তী হলে জাহাজখানায় দেখা গেলো জাহাজের ডেকে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু তারা যেমন দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তেমনি রয়েছে এক চুলও কেউ এদিক ওদিক যাচ্ছে না বা কোন কথা বার্তা বলছেনা।

জলদস্যুগণ বলে উঠলো—ওস্তাদ তাজ্জব ব্যাপার জাহাজে লোকজন সব যেন প্রাণহীন মনে হচ্ছে ব্যাপার কি?

বনহুর নিজেও অবাক হয়ে গেছে, সে বললো—প্রাণহীন বলে মনে হচ্ছে না একেবারে প্রাণহীন তাতে কোন সন্দেহ নাই।

জাহাজখানা ততক্ষণে একেবারে কাছাকাছি এসে গেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জলদস্যুদের জাহাজখানায় এসে লেগে যাবে।

বনহুর বুঝতে পারলো ঐ জাহাজে নিশ্চয়ই এমন কিছু একটা ঘটেছে যার জন্য জাহাজের সমস্ত খালাসী বা নাবিকগণ মৃত্যুবরণ করেছে। যে যেখানে যেমন ছিলো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কারো দেহে প্রাণ নেই।

বনহুর বুঝতে পারলো এটা কারেন্ট বা বিদ্যুৎ-এর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। আরও বুঝতে পারলো ঐ জাহাজেই কারেন্ট বা বিদ্যুৎ সংযোগ

রয়েছে। বনহুর বলে উঠে—শীগগীর চম্বুকের সুইচ অফ করে দাও-নইলে এ জাহাজখানা আমাদের জাহাজের গায়ে সংলগ্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই মৃত্যুবরণ করবো।

ওস্তাদের আদেশ পাওয়া মাত্র জলদস্যুগণ চুম্বক মেশিনের সুইচ অফ করে দিলো। অমনি মালবাহী জাহাজখানা যেন হোচট খেয়ে থেমে গেলো। হঠাৎ ধাক্কা খেঁয়ে থেমে যাওয়ায় মালবাহী লৌহ জাহাজ ঘুরপাক খেয়ে ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে লাগলো।

বনহুর বললো—এই মুহূর্তে তোমরা এক ভীষণ মৃত্যু থেকে রেহাই পেলে।

জলদস্যুগণ ঘিরে দাঁড়ালো ওস্তাদকে।

বনহুর বলে চলেছে—জানো এ জাহাজখানাতে এক ভয়ঙ্কর জিনিস সংযোগ হয়ে গিয়েছিলো যার জন্য এ জাহাজের সবগুলো খালাসি এবং নাবিক মৃত্যুবরণ করেছে। জিনিসটা হলো বৈদ্যুতিক কারেন্ট। এ কারেন্ট দ্বারা সমস্ত জাহাজে এক মারাত্মক অবস্থা ধারণ করেছিলো ভাগ্যিস এ জাহাজখানা আমাদের জাহাজের সঙ্গে সংলগ্ন হয়নি। হলে আমরা কেউ রক্ষা পেতাম না।

জলদস্যুগণ ওস্তাদকে ধন্যবাদ জানালো।

জীবন রক্ষা পাওয়ার জন্য সবাই আনন্দধ্বনি করতে লাগলো। জলদস্যুদের একজন বললো—ওস্তাদ চলুন ফূর্তি করা যাক।

সর্দারের সঙ্গে অনুচরদের আচরণের পদ্ধতি লক্ষ্য করে মনে মনে হাসলো বনহুর। সে নিজেও দস্যু সর্দার অথচ তার অনুচরগণ তার সঙ্গে এত সমীহ এবং সংযতভাবে কথা বার্তা বলে। কারো সাধ্য নেই কোন সময় তার সম্মুখে কোন রুচীহীন অশ্লীলতাপূর্ণ কার্যকলাপ করে।

জলদস্যু সর্দারের অনুচরগণ সর্দারকে নিয়েই ফুর্তি করবে বলে অগ্রসর হলো।

বিরাট জাহাজের মাঝখানে যে ক্যাবিনটা সবচেয়ে বড় সেই ক্যাবিনে এসে জড়ো হলো সবাই। কোরা, মাধা ও রামা এরা তিনজন সর্দারের মতই বলিষ্ঠ জোয়ান এবং শক্তিমান। এদের তিন জনের চেহারাও এক একটা ভয়ঙ্কর জানোয়ারের মত।

এরা তিনজন সর্দারের পাশে ঘিরে বসলো।

সম্মুখে টেবিলে অনেকগুলো বোতল আর অনেকগুলো গেলাস।

সর্দারসহ জলদস্যুরা এসে বসতেই একটি নর্তকী এসে দাঁড়ালো। বয়স চব্বিশ কিংবা পঁচিশ হবে। পরনে ঘাগড়া, মাথার চুল বিনুনী করা। বেনুনীতে জরির ফিতা জড়ানো। গায়ে জামা এবং একটি ফিনফিনে পাতলা ওড়না। যার মধ্য দিয়ে ওর সমস্ত দেহটা দেখা যাচ্ছে। চোখে কাজল, ঠোঁটে এবং গালে আলতা মাখানো।

অভিনব ভঙ্গীতে এসে দাঁড়ালো নর্তকীটা সর্দারের সম্মুখে। দু'চোখে বিশ্রী লালসাপূর্ণ চাহনী। সেলাম জানালো যে সবাইকে নাচের ভঙ্গীমায়।

সবাই ওকে বাহবা দিয়ে হাস্যধ্বনি করে অভিনন্দন জানালো।

বনহুর ভাবছে কে এই নর্তকী? সকালে যে তার শয্যায় গিয়ে তার দেহের উপর ঢলে পড়ছিলো একি সেই মনিমালা? না সে নয়—তবে কি এরই নাম সূর্যমুখি? না যে রাতে নাচ দেখালো সর্দারকে সেই এই সুরমা? কে এই নারী, কে জানে।

জলদস্যু সর্দারের বেশে বনহুরকে অভিনয় করতে হবে। এদের ঘাটি বা আস্তানার সন্ধান নিতে হবে তাকে। বনহুরকে তাহলে আজ সত্যি সত্যি মদ খেতে হবে কিন্তু কি করে তা সম্ভব।

ততক্ষণে নর্তকী গেলাসে মদ পূর্ণ করে এগিয়ে ধরেছে সর্দারের সামনে।

বনহুর হাত বাড়িয়ে নর্তকীর হাত থেকে কাঁচ পাত্রটা হাতে নেয়।

ওদিকে জলদস্যুগণ সবাই এক একটা গেলাস হাতে তুলে নিয়ে বোতল থেকে মদ ঢেলে গলধঃকরণ করতে লেগে গেছে।

বনহুর কণ্ঠস্বর জলদস্যু সর্দারের অনুকরণে বললো—এবার নাচ দেখাও সুন্দরী!

নর্তকী খিল খিল করে হেসে উঠলো—বাঃ নতুন নাম দিলে?সুরমা বলে ডাকবে না?

বললো বনহুর—তুমি কি সুন্দরী কম? নাচো এবার সুরমা। বনহুর বুঝতে পারলো এর নামই সুরমা।

সুরমা ততক্ষণে নূপুরধ্বনি তুলে নাচতে শুরু করে দিয়েছে। হেসে দুলে, বিনুনী দুলিয়ে, মাজা ঘুরিয়ে নানা ভঙ্গীমায় নাচছে।

জলদস্যুদের মধ্যে বিপুল আনন্দ ধ্বনি জাগে।

কেউ বা শিস দেয়।

কেউ বা কাঁচ পাত্র হাতে সুরমার সঙ্গে নাচতে শুরু করে। কেউ বা জাহাজের মেঝেতে বসে হামাগুড়ি দেয়।

বনহুর সেই ফাঁকে নিজের হাতের কাঁচ পাত্র থেকে মদগুলো ঢেলে দেয় মেঝেতে। টেবিলের আড়াল থাকায় কেউ তা লক্ষ্য করেনা। বনহুরের মুখে কালো কাপড় বাঁধা রয়েছে সে খালি গেলাসটা কাপড়ের নিচে নিয়ে মুখে ধরে যেন সে মদপান করছে।

নাচ গান আর জলদস্যুদের জড়িত কণ্ঠস্বরে সমস্ত জাহাজ মেতে উঠে।

নর্তকী সুরমা যখন নাচছিলো তখন জলদস্যুরা কেউ বা ওর আঁচল ধরে টানছে কেউ বা ঘাগড়া ধরে। কেউ বা বিনুনী ধরে।

সুরমা নাচ শেষ করে অকস্মাৎ দু'হাত প্রসারিত করে জড়িয়ে ধরলো বনহুরের গলা— সর্দার।

বনহুর মুহূর্তে সংযত হয়ে সোজা ভাবে উঠে দাঁড়ালো। নর্তকীর হাত দু'খানা আপনা আপনি খসে এলো ওর গলা থেকে। কারণ বনহুর দীর্ঘদেহী নর্তকী ছিলো বেটে মত কাজেই বনহুরের কণ্ঠ তার নাগালের বাইরে।

সুরমা অভিমানে মুখ ভার করে বললো—বখশীস দিলে না?

বখশীস ধরা রইলো তোমার জন্য।

বনহুর কথাট বলে টলতে টলতে বেরিয়ে যায়। অত্যাধিক সারাব পানের পর মানুষের অবস্থা যেমন হয় ঠিক তেমনি করে।

সুরমা কিছুটা অবাক হয়।

কোরা সুরমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—দুঃখ করিস না সুরমা সর্দারের মন ভাল নেই তাই তোকে রেখে চলে গেলো।

সুরমা অবাক হয়ে বলে—কেনো সর্দারের মন ভাল নেই? কেনো?

ও তোরা বুঝবিনা। মেয়ে মানুষ তোরা শুধু নাচতে আর গাইতে জানিস আর জানিস...

কোরা যাতা বলবিনা। সর্দার আজ যেন কেমন হয়ে গেছে।

হবে না আজ জাহাজ সহ সবাই মরতাম। বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছিস।

তার মানে?

মানে সবাই মরতাম...

সে কেমন রে কোরা?

কোরা বেশি মদ পান্ন করেছিলো তাই বার বার সে ঢেকুর তুলছিলো বললো—বল না রাঘা সব খুলে বল সুরমার কাছে।

এ্যাঁ আমি বলবো?

হাঁ বল।

এসো সুরমা আমার কাছে এসো।

সুরমা এসে বসে রাঘার কাছে।

রাঘাও ঢেকুর তুলছিলো তবু বলতে শুরু করলো—একটা বড় মিস হয়ে গেলো। এক জাহাজ মাল হাত ছাড়া হয়েছে আমাদের। সর্দারের মন তাই ভাল না।

সুরমা বলে উঠে—তবে যে কোরা বললো—বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছি আমরা।

এতোক্ষণ মাধা গেলাসের পর গেলাস ঢক ঢক করে খাচ্ছিলো সে গেলাস রেখে উঠে দাঁড়ালো, বললো শোন সুরমা আমি বলছি।

বলো কি করে আমরা জীবনে বেঁচে গেলাম?

সে এক ভীষণ ব্যাপার।

ভূমিকা রেখে বলো!

দূরে একটা জাহাজ দেখে আমরা সর্দারকে সংবাদ দিলাম। সর্দার তো শুনে ছুটে এলো। চুম্বক মেশিন চালু করতেই জাহাজখানা তীর বেগে আমাদের জাহাজের দিকে আসতে লাগলো। আমরা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সবাই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সর্দার চোখে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে দেখছিলো। জাহাজখানা যে মালবাহী এটা আমরা অল্পক্ষণেই বুঝতে পেরেছিলাম।

তারপর?

জাহাজখানা আরও এগিয়ে এলো। সর্দার বললো, ঐ জাহাজে একটি মানুষকে নড়াচড়া করতে দেখা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা বড় রহস্যজনক বলে মনে হলো।

সুরমা বলে উঠলো—ঠিক বলেছো মাধা—জাহাজের কোন মানুষকে নড়াচড়া করতে না দেখাটা বড় রহস্যপূর্ণ মনে হচ্ছে। বলো তারপর?

জাহাজখানা আরও নিকটে এসে গেছে। তখনও দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে দেখছিলো। সে বলে উঠলো—জাহাজে লোক দেখা যাচ্ছে কিন্তু তারা যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেউ একটুও নড়ছেনা। ব্যাপার কি?

সুরমা দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে শুনছিলো।

মাধা বলে চলেছে।

তখন অন্যান্য জলদস্যুগণ যে যা মুখে আসছে আবোল তাবোল বলা কওয়া করছে। কেউ নাচছে কেউ গান ধরেছে, সবাই নেশাতে চুর চুর।

মাধাও নেশায় টলছে, কথাগুলোও সব এলোমেলোভাবে বলছে—জাহাজখানা এসে গেলো। এই আমাদের জাহাজের গায়ে লেগে যাবে আর কি ঠিক ঐ মুহূর্তে সর্দার তাড়াতাড়ি চুম্বক মেশিনের সুইচ অফ করে দিতে বললো। আমরা সর্দারের কথা মত কাজ করলাম। জানো সুরমা চুম্বক মেশিনের সুইচ অফ করার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসা জাহাজখানা হোচট খেয়ে যেন থেমে গেলো অমনি এক ঘুরপাক খেয়ে ধীরে ধীরে সাগরবক্ষে তলিয়ে গেলো সেই মালবাহী জাহাজখানা...

এতে আর সর্দারের মন খারাপ হবার কথা কি?

আগে সব শোন তারপর বলো। জানো সুরমা ঐ জাহাজে কি ছিলো আর কেনোই বা ও জাহাজের সব লোকজন অমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো?

তা কেমন করে জানবো?

কারেন্ট। বিদ্যুৎ কারেন্ট দ্বারা সমস্ত জাহাজাখানা মারাত্মকভাবে সংযোগ হয়েছিলো এবং সে কারণেই ও জাহাজের সব খালাসী আর নাবিক মৃত্যু বরণ করেছিলো।

সত্যি!

হাঁ, জাহাজখানা যদি আমাদের জাহাজের গায়ে এসে লাগতো তা হলে আমাদের অবস্থায়ও ঠিক ঐ জাহাজের নাবিক আর খালাসীদের মত হতো বুঝলে? তাই ওস্তাদের মনটা বড় ভাল নেই আজ মনে হচ্ছে।

মরণের মুখ থেকে বাঁচলাম আমরা এটা তো আরও বেশি আনন্দের কথা। ওস্তাদ আনন্দ না করে বিদায় নিয়ে গেলো।

ও যেতে দাও সুরমা? আমরা তো রয়েছি একটা নাচ দেখাও......

আর একজন বলে উঠে—একটা নয় দু'টো...আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সে।

অপর একজন বলে—না তিনটে নাচ দেখাতে হবে না হলে আমরা সুরমাকে নিয়ে চোখে পরবো।

সুরমাকে নিয়ে যখন জলদস্যুগণ নানারকম কথাবার্তা বলছে ঠিক তখন পাশের ক্যাবিনে কয়েকজন জলদস্যু নতুন মেয়েটা সম্বন্ধে বলা কওয়া করছে।

একজন বলছে—ওকে নিয়ে ওস্তাদ শুধু ফুর্তি করবে আর আমরা ফাঁকি যাবো। তা হবেনা আমরাও ওকে চাই?

আর একজন বললো—সাবধান ওস্তাদ যদি জানতে পারে তুই এ কথা বলেছিস তা হলে গর্দান যাবে বুঝলি?

কেনো ওকে তো আমরাই লুট করে এনেছি। তা শুধু শুধু ওস্তাদের জন্য নাকি?

তবে কি?

তুই যা বলিস মেয়েটাকে আমার খুব পছন্দ।

আস্তে বল, আস্তে বল ওস্তাদ শুনে ফেলবে। এখন বল ওকে ওস্তাদের ক্যাবিনে দিয়ে আসি।

আর আমরা?

আমরা সুরমার নাচ দেখিগে চল। সুরমাই আমাদের ভাল বুঝলি?

চল তবে ওকে ওস্তাদের ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে আসি?

চল।

বেরিয়ে যায় দু'জন অনুচর।

❑

বনহুর ক্যাবিনে পায়চারী করছিলো।

ক্যাবিনের দরজা ভেতর থেকে আটকানো। বনহুর বলে দিয়েছে আমাকে তোমরা সব সময় বিরক্ত করবে না। যখন প্রয়োজন হবে আমি তোমাদের ডেকে নেবো।

বনহুর অনুচরদের আনন্দ উৎসব থেকে সরে এসে ক্যাবিনে পায়চারী করছিলো আর ভাবছিলো আগামীতে তাকে কি কাজ করতে হবে, কিভাবে এদের জলদস্যুতা থেকে অন্য কাজে নিয়োজিত করবে। এদের সর্দারকে ধ্বংস করেছে—সবচেয়ে কঠিন যে কাজ তার সমাধা হয়েছে...কিন্তু কয়েকজন জলদস্যু আছে যারা সর্দারের চেয়ে কম নয়। এদের শায়েস্তা না করলে উপায় নাই। ......

হঠাৎ দরজায় আঘাত করে ডাকে, ওস্তাদ—ওস্তাদ—দরজা খুলুন।

বনহুর নিজের মুখের আবরনী টেনে দেয় তারপর ক্যাবিনের দরজা খুলে ফেলে। দরজা খুলতেই বিস্মিত হয় দু'জন অনুচর সেই তরুণীটিকে জোর পূর্বক ধরে এনেছে তার ক্যাবিনে। মেয়েটি আলু থালু বেশ, চোখে মুখে ভয় বিহ্বল ভাব। কেঁদে কেঁদে দু'চোখ লাল টকটকে হয়ে উঠেছে।

বনহুর দরজা খুলতেই জলদস্যু অনুচরদ্বয় মেয়েটিকে জোরপূর্বক টেনে হিচড়ে ক্যাবিনের মধ্যে এনে ঠেলে দেয় তারপর বেরিয়ে যায় ওরা।

মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠে—না না আমাকে তোমরা এখানে রেখে যেওনা...আমাকে তোমরা নিয়ে যাও বন্দী করে রাখো তবু এখানে রেখে যেওনা.......

মেয়েটি ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

অনুচরদ্বয় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তাকায় তরুণীটির দিকে। একজন পুনরায় ওকে ঠেলে দিতে যাচ্ছিলো অমনি বনহুর তরুণীর হাতখানা ধরে ফেলে অনুচরদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলে—তোমরা যাও।

ওরা চলে যায়।

তরুণী ভয়ার্তভাবে চিৎকার করে উঠে—শয়তান আমাকে তুমি মেরে ফেলো। আমাকে তুমি মেরে ফেলো.......

বনহুরের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করে দেয় তরুণী কিন্তু এক চুল সে নড়তে পারে না। বনহুর ক্যাবিনের দরজা আটকে দেয়।

তরুণী এবার বনহুরের হাত থেকে নিজকে ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত ক্যাবিনের এক পাশে গিয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। এলোমেলো চুল, পরিধেয় বসন ভুলুণ্ঠিত। জামাটার স্থানে স্থানে ছিড়ে তরুণীর শুভ্র দেহের

মাংস পেশীগুলো নজরে পড়ছে। বনহুরের দিকে তাকিয়ে আছে সে কাতর করুণ অসহায় চোখে। হিংস্র ব্যাঘ্রের মুখে মেষ শাবকের যেমন অবস্থা হয় ঠিক তেমনি।

বনহুর ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করে কয়েক পা এগুলো মাত্র তারপর সে একটা সোফায় বসে পড়ে মুখের আবরণ খুলে ফেললো।

চমকে উঠলো তরুণী এতো সে মুখ নয়। সেই ভীষণ ভয়ঙ্কর নরপশু মুখ তো এমন ছিলো না। এ তা হলে কে? তবে কি সে নয়? তরুণীর দু'চোখে বিস্ময়।

বনহুর বলে—ভয় নেই আমি আপনাকে স্পর্শ করবো না। আপনি এসে বসুন......

ধীরে ধীরে তরুণীর মুখমন্ডল থেকে ভীত আতঙ্কিত ভাব মুছে যায় সে যে ভাবে জড়ো সড়ো হয়ে কুঁকড়ে দাঁড়িয়েছিলো এবার তরুণী সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

বনহুর ততক্ষণে নিজের মুখ থেকে বৃহৎ আকার গোঁফ জোড়া খুলে ফেলে। যে গোঁফ জোড়া সে তৈরী করেছিলো জলদস্যু সর্দারের মাথার চুল দিয়ে। কিছুটা চুল দিয়ে বনহুর নিজের ভ্রু জোড়াও তৈরি করে নিয়েছিলো। ভ্রু এবং গোঁফ জোড়া খুলতেই বনহুরের নিজস্ব চেহারা ফুটে উঠলো।

তরুণীর চোখে মুখে আশ্চর্যভাব ফুটে উঠেছে। গতরাতে যে নরপশু তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছিলো এ সে নয়। তবে একে সে দেখেছিলো হাত পিছ মোড়া করে বাধা অবস্থায় ক্ষণিকের জন্য। তরুণী মুহূর্তে বুঝে নেয় এ সেই ব্যক্তি যার আগমনে শয়তানটা ক্ষণিকের জন্য তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলো।

তরুণীকে ভাবতে দেখে বলে বনহুর—হয়তো সব বুঝতে পেরেছেন? আপনি যে জাহাজের যাত্রী ঠিক আমিও সেই জাহাজের যাত্রী। আপনি যেমন বন্দী আমিও তাই ছিলাম তবে কৌশলে জলদস্যুকে হত্যা করে আমি সেই স্থানে মানে অভিনয় করছি বলতে পারেন। আসুন কোন ভয়ের কারণ নেই।

তরুণী অসংযত কাপড় ঠিক করে নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে।

বনহুর বলে—বসুন এই আসনটায়।

তরুণী যন্ত্রচালিতের মত আসন গ্রহণ করে।

বনহুর একটা সিগারেট বের করে অগ্নি সংযোগ করে একমুখ ধোয়া ছেড়ে বলে—কিছু ভাববেন না। এখন থেকে আপনি নিশ্চিন্ত কারণ আমার কাছে আপনার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তরুণী দু'হাতে মুখে ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো কাঁদতে কাঁদতে বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—আমার সব গেছে কি হবে আমার এ জীবন দিয়ে......আমি আত্নহত্যা করবো......

আপনি মিছামিছি উত্তেজিত হচ্ছেন। যা গেছে তাতো আপনার ইচ্ছাকৃত নয়। কেন আপনি আত্নহত্যা করতে চান? আপনার সম্মুখে এখন আগামী দিনগুলো পড়ে আছে। জীবনের প্রথম ধাপে সবে মাত্র পা রেখেছেন।

বনহুরের কথাগুলো তরুণীর হৃদয় স্পর্শ করে। এমন পৌরুষ দীপ্ত কণ্ঠস্বর সে ইতিপূর্বে কমই শুনেছে! এমন সৌম্য সুন্দর পুরুষ তার দৃষ্টিতে আজও পড়েছে কিনা সন্দেহ। নিস্পলক চোখে তরুণী বনহুরের দিকে তাকিয়ে তার কথাগুলো শুনছিলো। বনহুর বলে চলেছে যতদিন এ জাহাজে আমরা আছি ততদিন একটা কাজ আপনাকে করতে হবে বলুন করবেন। হাঁ, তার পূর্বে বলুন আপনার নাম কি।

তরুণী আঁচলে চোখ মুছে নাম বলতে গিয়ে পুনরায় কেঁদে উঠে সে।

বনহুর বলে—থাক তাহলে নাম শুনে কাজ নেই।

না আমি বলছি আমার নাম হুসনা। আপনি আমাকে নাম ধরে ডাকবেন।

যদি কিছু মনে না করেন আরও কয়েকটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো।

আচ্ছা করুন?

তরুণী বনহুরের কাছে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে তবে লজ্জায় মাথাটা সে নত করে কথা বার্তা বলছিলো।

বনহুর বলে—এ জাহাজে থাকতে হলে আপনাকে প্রতিদিন আমার ক্যাবিনে আসতে হবে। অবশ্য জলদস্যুরা আপনাকে জোরপূর্বক নিয়ে আসবে আপনি ভয় পাবেন না কারণ আমি পূর্বেই বলেছি আমার দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবেনা। বুঝেতে পারছেন কেনো আমি বললাম।

হাঁ পেরেছি আমাকে রক্ষা করার জন্যই আপনি এক কাজ করবেন।

নিশ্চয়ই।

জানিনা আপনি কে। হয়তো খোদা আম্মাকে রক্ষা...কিছু বলতে গিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে আবার হুসনা কেঁদে উঠলো—জীবন রক্ষা পেয়ে আর কি লাভ হবে আমার আমি যে অপবিত্রা......

ছিঃ ছিঃ আপনি মিছিমিছি মনকষ্ট পাচ্ছেন। যা ঘটেছে তাতো আপনার ইচ্ছাকৃত নয়। কেনো এ সব চিন্তা করে আপনি মুষড়ে পড়ছেন?

আপনি তো জানেন মেয়েদের সতীত্ব পরম ধন যা একবার হারালে আর কোনদিন ফিরে পাওয়া যায়না।

বনহুর এবার সোফায় হেলান দিয়ে সিগারেট থেকে ধূম্র নির্গত করে চলে। এ জাহাজে বনহুর সর্দারের ক্যাবিনে প্রচুর সিগারেট পেয়েছিলো শুধু সিগারেট নয় চুরুট, মূল্যবান তামাক, গাঁজা, মদ, আরও অনেক কিছু। কিন্তু এতোসবে প্রয়োজন ছিলোনা বনহুরের তার প্রয়োজন শুধু মূল্যবান সিগারেটের।

কিছুক্ষণ এক মনে সিগারেট পান করে সোজা হয়ে বসলো তারপর বললো—আপনি এবং আমি একই জাহাজ ঈগলের যাত্রী আমাদের যখন উভয়ের একই অবস্থা তখন আমাদের উভয়ের সম্বন্ধে উভয়কে জানা দরকার। আচ্ছা বলুন আপনার সঙ্গে কে ছিলেন এবং আপনার গন্তব্যস্থান কোথায় ছিলো?

হুসনা তাকালো বনহুরের মুখের দিকে তারপর দৃষ্টি নত করে নিয়ে বললো—আমি জিহাংহায় পড়াশোনা করতাম। ডিগ্রি শেষ করে ফিরে যাচ্ছি কান্দাই।

কান্দাই?

হাঁ আমার বাবা কান্দাই চাকরী করেন।

কি নাম তাঁর?

আমার বাবা মিঃ ফারুক আহসান।

একরাশ সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তরুণীর মুখে, বলে প্রখ্যাত ডিটেকটিভ মিঃ ফারুক আহসানের কন্যা আপনি?

হাঁ, কিন্তু আপনি আমার বাবাকে চিনলেন কি করে?

এতো বড় নামকরা ডিটেকটিভ তাঁকে চিনবো না বলেন কি মিস হুসনা! তবে একটি কথা জিজ্ঞেসা করি আপনি প্লেনে না গিয়ে জাহাজে যাচ্ছিলেন কেনো, জানতে পারি কি? নিশ্চয়ই সখ করে।

হাঁ আপনি ঠিক বলেছেন প্রতিবার প্লেনে যাই এবার জাহাজে...

বুঝেছি সাগর ভ্রমণের সখ দমন করতে পারেন নি—যেমন আমি পারিনি। আচ্ছা মিস হুসনা?

বলুন।

কান্দাই থেকে জিহাংহা শুধু হাজার হাজার মাইল দূরেই নয়। জিহাংহা এক অজানা দেশ বলা যায়। আপনি পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে না গিয়ে এসেছিলেন জিহাংহায় কিছুটা আশ্চর্য বটে।

সবাইতো বিদেশ গিয়ে পড়াশোনা করে, আমার ইচ্ছা ছিল অজানা কোন দেশে যাবো যেদেশে কেউ যায় নি এমন দেশে।

আপনার ইচ্ছা কি পূর্ণ হয়েছিলো বা হয়েছে?

হাঁ আমি ডিগ্রি শেষ করে ফিরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সব বাসনা আমার ধূলিস্মাৎ হয়ে গেলো। কি হবে আমার এ জীবন রেখে...

আবার আপনি অবুঝ হচ্ছেন। কথাটা অন্যদিকে মোড় ফেরাবার জন্য বনহুর বললো—মিস হুসনা আমার গন্তব্যস্থানও কান্দাই। যদি সম্মুখ বিপদগুলো কাটিয়ে উঠতে পারি তাহলে আমরা উভয়েই কান্দাই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে আশা করি। আচ্ছা মিস হুসনা আপনার বাবা মিঃ ফারুক আহসান এখন কান্দাই কেনো অবস্থান করছেন জানেন কি?

হাঁ জানি, বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য তিনি অবস্থান করছেন।

হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বনহুর।

বিস্ময় নিয়ে তাকায় হুসনা বনহুরের মুখের দিকে। এমন করে সে কোনদিন কাউকে হাসতে দেখেনি, অদ্ভুত সে হাসি।

বনহুর হাসি থামিয়ে বলে—মিস হুসনা।

বলুন?

দস্যু বনহুরকে আপনি দেখেছেন?

দু'চোখ গোলাকার করে বলে হুসনা—দস্যু বনহুর সম্বন্ধে আপনি জানেন না তাই এ কথা বলছেন। সে অতি ভয়ঙ্কর জিনিস।

রাক্ষসের মত ভয়ঙ্কর না হিংস্র জন্তুর মত?

জানিনা, তবে কান্দাইবাসীরা জানে সে এক আতঙ্ক। ভয়ে কেউ কোন সময়ও নাম মুখে আনে না। গভীর রাতে সে জমকালো অশ্বে চেপে আসে, হানা দিয়ে সে হত্যা করে গৃহস্বামীকে, লুটতরাজ করে নিয়ে যায় সব কিছু।

তাই নাকি।

হাঁ আপনি কান্দাই থাকেন অথচ দস্যু বনহুরের নাম শোনেন নি?

বহুদিন দেশ ছাড়া তাই শুনিনি।

সংবাদপত্রে দেখেননি দস্যু বনহুরের কার্যকলাপ—কত কথা বের হয়?

তা দেখেছি কিন্তু ও সব বিশ্বাস হয় নি আমার।

আশ্চর্য মানুষ আপনি!

কি রকম?

দস্যু বনহুর বিশ্ব বিখ্যাত দস্যু, তাকে আপনি বিশ্বাস করেন না।

কোন সময় তার সান্নিধ্য পাইনি কিনা তাই হয়তো...

ক্যাবিনের দরজায় ধাক্কা পড়ে—ওস্তাদ খাবার এনেছি।

বনহুর তাড়াতাড়ি ভ্রু জোড়া এবং গোঁফ আটা দিয়ে আটকিয়ে নেয় তারপর দরজা খুলে দেয় সে।

দু'জন অনুচর একটা বড় রেকাবীতে মাংস রুটী মাখন ডিম আর দু'বোতল মদ নিয়ে হাজির হলো। মাথা নিচু করে কুর্ণিশ জানিয়ে ক্যাবিনের টেবিলে রেকাবীসহ জিনিসগুলো রেখে বেরিয়ে গেলো।

অনুচরদ্বয় খাবার রেখে যেতেই বনহুর কিছু তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরলো হুসনার দিকে—নিন আগে খেয়ে নিন।

বনহুর হুসনার হাতে খাবার তুলে দিয়ে নিজেও শুরু করে।

হুসনার ক্ষুধা পেয়েছিলো সেও খেতে লাগলো। না খেয়ে তো কোন উপায় নেই।

বনহুর খাওয়া শেষ করে একটু হেসে বললো—এবার এগুলোর ব্যবস্থা করতে হয়। মদের বোতলটা হাতে তুলে নেয় সে।

হুসনা দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকায়, বলে সে—আপনি মদ খান?

না খেলেও এর একটা সৎগতি করতে হবে তো। বোতল হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় তারপর গেলাসে ঢেলে নিয়ে ফেলে দেয় ক্যাবিনের জানালা দিয়ে বাইরে।

খালি বোতলটা রেখে দেয় রেকাবীর উপর। অবশ্য গেলাসে কিছুটা লেগে থাকে, গেলাস দেখে যেন ওরা মনে করে বোতলের সমস্ত মদ ওস্তাদ পান করেছে।

বনহুর বলে—মিস হুসনা এবার আপনি যেতে পারেন অবশ্য আপনাকে অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন ভাব দেখাতে হবে যেন আপনি নির্যাতীতা।

হুসনার দু'চোখ ছল ছল করে উঠে। কৃতজ্ঞতা ভরা গলায় বলে—সত্যি আপনি কত মহৎ, কত মহান...

ঐ সময় দু'জন অনুচর পুনরায় আঘাত করে। ওরা খাবারের শূন্য পাত্র নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। ক্যাবিনে প্রবেশ করলে বলে বনহুর —একে নিয়ে যাও।

হুসনাকে নিয়ে ওরা বেরিয়ে যায়।

যাবার সময় বলে দেয় বনহুর—ওকে ভালভাবে রেখো যেনো কোন অযত্ন না হয়।

আচ্ছা ওস্তাদ। যেতে যেতে বলে ওরা।

বনহুর সবেমাত্র শয্যায় গা এলিয়ে দিয়েছে ঠিক ঐ মুহূর্তে কয়েকজন অনুচর ছুটে আসে, ওস্তাদ একটা যাত্রীবাহী জাহাজ দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি আসুন...

যাও আমি আসছি। বললো বনহুর।

অনুচরদের একজন বলে উঠলো—ওস্তাদ জাহাজখানায় প্রচুর ধন সম্পদ আছে বলে মনে হচ্ছে। চুম্বক মেশিন কি চালু করে দেবো?

না আমি নিজে আগে দেখবো তারপর কি করতে হবে বলবো। বনহুর উঠে বেরিয়ে এলো জাহাজের ডেকে।

চোখে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে দেখতে লাগলো, দূরে একটি যাত্রীবাহী জাহাজ দেখা যাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখছে বনহুর ঐ সময়, তার চার পাশে জলদস্যুগণ অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু ওস্তাদের আদেশের প্রতিক্ষা মাত্র।

ওস্তাদের বিলম্বে অনুচরদের অস্থিরতা বেড়ে উঠে তারা বলে—ওস্তাদ বলুন চুম্বক মেশিন চালু করবো।

বনহুর আদেশ না দিয়ে পারে না, বললো—হাঁ এবার চালু করে দাও।

অনুচরগণ হর্ষধ্বনি করে উঠলো।

দু'জন গিয়ে চুম্বক মেশিন চালু করে দিলো।

বনহুর দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে তাকিয়ে আছে দূরে বহু দূরে জাহাজখানার দিকে। জাহাজখানা এগুচ্ছে বলে মনে না হলেও অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলো জাহাজখানা দ্রুত এগিয়ে আসছে।

অদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন এই চুম্বক মেশিন যার শক্তি শত শত মাইল দুরেও কাজ করে। যে কোন জাহাজকে এই চুম্বক মেশিন বা চুম্বক যন্ত্র আকর্ষণ করে টেনে আনে। জলদস্যুদের দস্যুতার এ এক চরম কৌশল। চুম্বক মেশিন দ্বারা এরা হাজার হাজার মানুষের সর্বনাশ করে।

জাহাজের যাত্রীগণ হয়তো নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ ক্যাবিনে বিশ্রাম করছে কিংবা গল্পসল্পে মেতে আছে। অথবা আমোদ-প্রমোদে মত্ত আছে এমন সময় জাহাজখানা আচম্বিতে এসে সংযোগ হয় জলদস্যুদের জাহাজের সঙ্গে। অকস্মাৎ ঝাপিয়ে পড়ে জলদস্যুগণ যাত্রীবাহী জাহাজে এবং চলে হত্যালীলা আর লুটতরাজ।

যদিও বনহুর নিজেও একজন দস্যু তবু তার মনে ব্যথা জাগে কারণ অহেতুক নরহত্যা তার পেশা বা নেশা নয়। লুটতরাজ করাও তার পেশা নয়। তবু কোন কাজই সে অন্যায়ভাবে করে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধেই তার সংগ্রাম।

বনহুরের চিন্তাধারা দ্রুত কাজ করছিলো আর ঘন্টা খানেকের মধ্যেই জাহাজখানা এসে পড়বে তাদের জাহাজখানার পাশে। এ জাহাজ থেকে মহা উল্লাসে ঝাপিয়ে পড়বে জলদস্যুগণ ঐ জাহাজে হত্যা এবং লুণ্ঠন চালাবে ইচ্ছা মত।

কিন্তু বেশি ভাববার সময় নেই ততক্ষণ যাত্রীবাহী জাহাজখানা একেবারে নিকটে এসে গেছে। মাত্র কয়েক মিনিট, জাহাখানা দেখতে দেখতে এসে সংযোগ হলো জলদস্যুদের জাহাজের সঙ্গে।

পরক্ষণেই মহা আনন্দে জলদস্যুগণ লাফিয়ে পড়লো যাত্রীবাহী জাহাজ খানায়। বনহুর চিৎকার করে বলছিলো—খবরদার তোমরা কাউকে হত্যা করবে না বন্দী করে এ জাহাজে আনবে না। মূল্যবান যা পাও নিয়ে আসবে অ-প্রয়োজনীয় জিনিস এনে অহেতুক জাহাজে ভার বোঝাই করো না।

সর্দারের কথাগুলো তাদের কাছে নতুন শোনালেও এ নিয়ে কেউ ভাববার সময় পেলো না। তারা যাত্রীবাহী জাহাজে ঝাপিয়ে পড়ে লুটতরাজ শুরু করে দিলো। তবে সর্দারের নির্দেশে কেউ হত্যা বা খুন জখম কাউকে করলো না।

অল্পক্ষণেই এরা যাত্রীবাহী জাহাজখানাকে তচনচ করে ফিরে এলো।

বনহুর সব কিছু লক্ষ্য করলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

সবাই ফিরে এসে চুম্বক মেশিনের সুইচ অফ্ করে জলদস্যু জাহাজ থেকে।

জলদস্যুগণ বললো—ওস্তাদ জাহাজ ছাড়বো?

হাঁ এবার ছাড়ো।

জাহাজ চলতে শুরু করলো।

জলদস্যুগণ আবার আনন্দে মেতে উঠলো।

দু'দিন ধরে চললো আনন্দ ফুর্তি আর নাচ গান। ওরা ওস্তাদকে নিয়েই ফুর্তিতে মেতে উঠলো। সুরমা বাঈ নাচ দেখাতে লাগলো।

মনিমালা আর সূর্যমুখি খুব করে সেজেছে। সর্দারকে ওরা গান শোনাবে।

সূর্যমুখি গান গাইতে শুরু করলো।

মুনিমালা তখন অভিমানে মুখ ভার করে রইলো। বনহুর বুঝতে পারলো মনিমালা রাগ করছে তাই ওর চিবুকে একটু নাড়া দিয়ে বললো রাগ করোনা মনিমালা সূর্যমুখির গান শেষ হলেই তোমার গান শুনবো।

মনিমালা ওর কথায় খুশি হলো। বনহুরের চোখে চোখ রেখে একটু মুচকি হাসলো সে!

সূর্যমুখির গান শেষ হতেই জলদস্যুগণ মহা উল্লাসে তাকে পুনরায় গান গাইবার জন্য বললো কিন্তু বনহুর বললো—না, এবার মনিমালা গান গাইবে।

মনিমালা খুশি হয়ে গাইতে শুরু করলো।

যদিও বনহুরের অসহ্য লাগছিলো তবু সে জলদস্যুদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আনন্দ করতে লাগলো, সূর্যমুখি কাঁচ পাত্র ভরে ভরে হাতে দিচ্ছিলো সর্দারের। ওরা সবাই সর্দারকে খুশি করার জন্য ব্যস্ত।

বনহুর কৌশলে কাঁচ পাত্র থেকে সারাবগুলো ঢেলে দিচ্ছিলো।

এক সময় আনন্দ উল্লাসের বেগ শিথিল হয়ে এলো।

জলদস্যুগণ অত্যন্ত সারাব পান করে যে যেখানে পারলো ঢলে পড়লো।

কয়েকজন গান শুরু করে দিলো।

কোরা আর মাধা এসে বললো ওস্তাদ নুতন মেয়েটাকে আপনার ক্যাবিনে পৌঁছে দেবো।

বনহুর বললো—না থাক। যখন প্রয়োজন ডেকে নেবো। হাঁ শোন তোমরা কেউ যেন ওকে বিরক্ত করোনা।

একজন হেসে বললো—সর্দারের নেক নজর পড়েছে বেচারী একটু জিরিয়ে নিক।

রাত বাড়ছে।

বনহুর ফিরে আসে নিজের ক্যাবিনে।

এসে ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করে সবেমাত্র দেহ থেকে জলদস্যু সর্দারের ড্রেস খুলতে যাচ্ছিলো ঠিক ঐ মুহূর্তে দরজায় ধাক্কা পড়ে।

বনহুর ড্রেস পরিবর্তন না করেই ক্যাবিনের দরজা খুলে দেয়; সঙ্গে সঙ্গে সাপ দেখার মত চমকে উঠে বনহুর, ঢোক গিলে বলে সূর্যমুখি তুমি!

হাঁ সর্দার অবাক হচ্ছো কেনো? কথাটা বলে ভিতরে প্রবেশ করে সূর্যমুখি। ঠোঁট দু'খানা আলতার রঙে রাঙা। ঝলমলে পোশাক পরে, খোপায় জরির ঝুরঝুরি ফুল। কানে কানবালা। চোখে কাজল, সূর্যমুখী এলিয়ে দিলো দেহখানা সর্দারের বিছানায়।

বনহুর মনে মনে প্রমাদ গুণলো, কিন্তু মুখোভাবে হাসি টেনে বললো—হঠাৎ কি মনে করে সূর্য মুখি?

সব ভুলে গেছো ওস্তাদ এর মধ্যে? আজ যে আমার দিন তা জানো না?

বনহুর বলে—ও ভুলেই গিয়েছিলো সূর্যমুখী। সব ভুলেই গিয়েছিলাম। কথাটা বলে বনহুর এগিয়ে যায় ওদিকে বড় আয়নাখানার দিকে। একবার

সে তাকিয়ে দেখে নেয় নিজের চেহারাটার দিকে। না তাকে চিনতে পারবে না সূর্যমুখি। নকল ভ্রু এবং গোঁফ দিয়ে তাকে ঠিক জলদস্যু সর্দারের মতই লাগছে।

ফিরে দাঁড়ায় বনহুর, পাশের টেবিল থেকে তুলে নেয় মদের বোতলটা। বাম হাতে বোতল আর ডান হাতে কাঁচ পাত্র। ছিপিটা বনহুর দাঁত দিয়ে খুলে ফেলে তারপর গেলাসে ঢেলে এগিয়ে আসে বিছানার পাশে। বাড়িয়ে ধরে বনহুর সূর্যমুখির দিকে—নাও?

সূর্যমুখি খিল খিল করে হেসে উঠে বসে বিছানায়, বলে সে—খুব তো দরদ দেখছি। এমন তো আদর করে কোনদিন খেতে দাওনি.......

সূর্যমুখির কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে বনহুর—তোমাকে বেশি ভালবাসি কিনা তাই। নাও খেয়ে একটা নাচ দেখাও দেখি।

সূর্যমুখি অভিমানে মুখ ভার করে বলে—আজ যে বড় নতুন কথা শোনালে ওস্তাদ। তোমাকে নাচ দেখানোর জন্য তো আছে সুরমা। সুরমার নাচ ছাড়া আমার নাচ তোমার পছন্দ হবে? সূর্যমুখি ঢলে পড়ে বনহুরের কোলে, দু'হাতে গলা ধরে বলে—ওস্তাদ তুমি যেন কেমন হয়ে গেছো?

তাই নাকি?

সত্যি তুমি ক'দিন হলো ঠিক যেন পাল্‌টে গেছো। আমাকে তেমন করে আর আদর করোনা। মনিমালাও অভিমান করেছে তার সঙ্গেও তুমি ভাল ব্যবহার করোনা। বুঝেছি ঐ নতুন মেয়েটা তোমার মন জয় করে নিয়েছে।

কি যে বলো সূর্যমুখি নতুন মেয়েটাকে আমার মোটেই পছন্দ নয়।

তবে যে তাকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করো?

হেসে বলে বনহুর—এটা কি আজ নতুন। যাক ওসব কথা, নাও খেয়ে নাও দেখি।

তুমি খাবে না?

আমার জন্য তো বহু আছে। খাও সূর্যমুখি......

সূর্যমুখি বনহুরের হাতখানা ধরে গেলাসটা নিজের মুখে চেপে ধরে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেলে।

বনহুর পুনরায় গেলাসটা পূর্ণ করে বলে—আর একটু খাও।

উঁ হুঁ বেশি খেতে পারবো না।

খাও...আর একটু খাও প্রিয়া।

সূর্যমুখি নতুন এ সম্বোধনে উল্লাসিত হয়ে উঠে, এ ডাক সে কোন দিন সর্দারের মুখে শোনে নি। সর্দার ডেকেছে পিয়ারী, মেরাজান, মেরী কলিজা এমনি কত কি কিন্তু আজ সর্দারের মুখে প্রিয়া ডাক অভিভূত করে তোলে। সূর্য মুখির চোখে তখন নেশা ধরে এসেছে। বনহুর ওর মুখে গেলাস ধরতেই আবার সে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলে।

বনহুর পর পর কয়েক গেলাস ওকে খাইয়ে দেয়।

ধীরে ধীরে সূর্যমুখির চোখ দু'টো মুদে আসে। এলিয়ে পড়ে ওর দেহখানা বনহুরের কোলের উপর।

বনহুরের মুখে ফুটে উঠে এক ঘৃণাপূর্ণ ক্ষীণ হাসির রেখা। আলগোছে সে ওকে শুইয়ে দিলো নিজের বিছানায়। তারপর বনহুর উঠে দাঁড়ালো, পায়চারী করতে লাগলো ক্যাবিনের মেঝেতে।

এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে তাকালো সূর্যমুখির সংজ্ঞাহীন দেহটার দিকে। মনে মনে ভাবলো ওর অপরাধ কি অপরাধ যারা ওকে এই জঘন্য কাজে অভ্যস্ত করে তুলেছে তাদের। নারী জাতি অবলা অসহায় তাদের নিয়ে ওরা যা খুশি তাই করে ওরা যেন ওদের খেলার পুতুল।

বনহুর সোফায় বসে পা দু'খানা তুলে দিলো সম্মুখস্থ টেবিলে তারপর সিগারেট ধরালো। চোখ দুটো বন্ধ করে ভাবতে লাগলো তার জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং শেষ কোথায়।

❑

ভোরে ঘুম ভাংতেই ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে বনহুর। সমস্ত রাত সে সোফায় অঘোরে ঘুমিয়েছে, কখন যে ভোর হয়ে গেছে বুঝতেই পারেনি। ঘাড়টা এক পাশে কাৎ হয়ে থাকায় কেমন ব্যথা অনুভব করছে ঘাড়ে। হাত দিয়ে ঘাড়টা একটু রগড়ে নিলো সে। সম্মুখে তাকাতেই নজরে পড়লো সূর্যমুখি এখনও সংজ্ঞাহীনের মত ঘুমাচ্ছে।

বনহুর একটা সিগারেট বের করে অগ্নি সংযোগ করতে যাবে অমনি দরজায় ধাক্কা পড়লো—ওস্তাদ। ওস্তাদ......

বনহুর তাড়াতাড়ি সূর্যমুখিকে বিছানার এক পাশে সরে শুইয়ে দিয়ে অপর বালিশখানা ঠিক সূর্যমুখির বালিশটার পাশে রাখলো যেন এই মুহূর্তে সে শয্যা ত্যাগ করে উঠে গেছে। দরজা খুলে দিতেই একজন জলদস্যু প্রবেশ করলো সেই ক্যাবিনে। ওস্তাদকে ছালাম জানিয়ে বললো—হুকুম করুন কি করতে হবে?

বনহুর ভ্রু কুঞ্চিত করে ভাবলো কি করবার জন্য নির্দেশ দেবে সে, তবু একটু ভেবে নিয়ে বললো—সূর্যমুখিকে নিয়ে যাও এবং তার নিজের ক্যাবিনে শুইয়ে দাও।

আচ্ছা ওস্তাদ। কথাটা বলে সে বেরিয়ে যায় একটু পরে দু'জন ফিরে আসে। সূর্যমুখিকে ওরা বের করে নিয়ে যায় কাধে তুলে।

বনহুর এবার মুক্ত জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তাকায় সে সম্মুখের সীমাহীন নীল আকাশের দিকে! মনটা অনেকখানি হাল্কা লাগছে কারণ আজও তাকে ওরা কেউ চিনতে পারেনি। যা হোক এবার তার কাজ শুরু করতে হবে। জলদস্যুদের আস্তানা কোথায় তাকে জেনে নিতে হবে তারপর হুসনাকে উদ্ধার করতে হবে এবং পৌছে দিতে হবে তার পিতামাতার কাছে।

চীন সাগর পাড়ি দিচ্ছে জাহাজখানা। চারিদিকে শুধু থৈ থৈ পানি। প্রচণ্ড প্রচণ্ড ঢেউগুলো আছড়ে আছড়ে পড়েছে জাহাজের গায়ে।

আকাশ মেঘ মুক্ত।

আকাশখানা গিয়ে ঠেকেছে সাগরের বুকে। তার বা গাছপালার চিহ্ন কোথাও নাই। আকাশে কোন পাখি উড়তে দেখা যায় না। শুধু নীল আর নীল চারিদিক। বনহুর হঠাৎ চমকে উঠলো, কারো ভারী বুটের শব্দ কানে এলো তার।

পিছনে ফিরে তাকাতেই জলদস্যু সর্দারের সহকারী কাফ্রী তাকে জানালো দূরে একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে কিন্তু জাহাজখানা পুলিশ বাহিনীর বলে মনে হচ্ছে।

ভ্রু কুঁচকে বললো বনহুর—পুলিশ।

হাঁ—চীনা গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ বাহিনীর জাহাজ বলে মনে হচ্ছে।

কি করে তুমি বুঝতে পারলে কাফ্রী?

তুমি দেখছি দিন দিন কেমন বোকা বনে যাচ্ছো। আমাদের পাওয়ার ফুল বাইনোকুলারে জাহাজের গায়ে লেখাগুলো পড়া যাচ্ছে।

তাই বলো! ওরা তো অনেকদিন থেকে আমাদের সন্ধানে চীন সাগর চষে বেড়োচ্ছে। যাহোক আমাদের কোন ক্ষতি ওরা করতে পারবে না।

ক্ষতি ওরা করতে না পারলেও আমরা ছাড়বোনা। সাবমেরিন দিয়ে পুলিশ জাহাটিকে ঘায়েল করে দেবো।

হাঁ ঠিক বলেছো কাফ্রী। জাহাজখানাতে নিশ্চয়ই পুলিশ ফোর্স এবং নানা রকম অস্ত্র শস্ত্র আছে এ সব আমাদের নষ্ট করতেই হবে। যাতে এরা আর কোনদিন আমাদের পিছু না নিতে পারে। কিন্তু সাব মেরিন নিয়ে পুলিশ জাহাজের ক্ষতি সাধন করতে গেলে আমাদেরও কিছু ক্ষতি হবে কাফ্রী। সাবমেরিনখানা বিনষ্ট হতে পারে। একটু থেমে বললো—বনহুর কাফ্রী।

বলুন ওস্তাদ?

সাবমেরিনখানা চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি।

ওস্তাদ।

হাঁ কাফ্রী আমি জানি তুমি আমার আদেশ অমান্য করবেনা।

কাফ্রী গম্ভীর কণ্ঠে বললো—রাঘু মাধা এরাও তো সাবমেরিন চালাতে জানে ওস্তাদ।

কিন্তু ওদের পাঠিয়ে ভরসা পাচ্ছিনা। কারণ ওরা গিয়ে যদি ঠিক মত কাজ সমাধা করতে না পারে তখন পুলিশ বাহিনীর কামান, মেশিন গান আমাদের জাহাজকে রেহাই দেবে না তার চেয়ে তুমি নিজে যাও সাবমেরিন চালনায় তুমি দক্ষ আমি জানি।

অবশ্য বনহুর আন্দাজে কথাটা বলেনি, একদিন কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে বনহুর জেনে নিয়েছিলো জলদস্যুদের জাহাজের নিচের কোন অংশে ডুবানো অবস্থায় রয়েছে ছোট্ট একটি সাবমেরিন। সাবমেরিনটা ছোট্ট হলেও

অত্যন্ত কার্যকরী এবং শক্তিসম্পন্ন। এ জাহাজে তিন চারজন সাবমেরিন চালনা জানে রাঘু, মাধা আর কাফ্রী। আরও দুজন অনুচর এরাও সাবমেরিন চালনায় দক্ষ ছিলো। বনহুর এই ক'দিনের মধ্যেই জলদস্যুদের সবকিছু জেনে নিতে সক্ষম হয়েছে।

বনহুর এটাও ভাল করে উপলব্দি করতে পেরেছে এই জলদস্যু দলটি অত্যন্ত ধূর্ত এবং ভয়ঙ্কর। এদের জাহাজে কয়েকটি সাংঘাতিক মেশিন আছে যে মেশিন দ্বারা জলদস্যুগণ বিভিন্ন আকারে দস্যুতা করে থাকে। সাবমেরিন যোগে এরা ডুবুভাবে অপর জাহাজের তলায় গিয়ে এমন একটি মেশিন সংযোগ করে দেয় যার দরুন জাহাজটির তলদেশে একটি বিরাট ফুটো বা ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ তলিয়ে যায় না, ধীরে ধীরে জাহাজখানা যখন তলিয়ে যেতে থাকে তখন এরা নিজেদের জাহাজ নিয়ে আক্রমণ চালায় মৃত্যু প্রায় যাত্রীদের উপর। হত্যা করে লুটতরাজ করে এরা ইচ্ছামত।

প্রত্যেকটা যন্ত্র এবং মেশিন বনহুর পরীক্ষা করে দেখেছে সবচেয়ে চুম্বক মেশিনটাই এ জাহাজের একটি অদ্ভুত মেশিন। যে মেশিনের সুইচ অন করবার সঙ্গে সঙ্গে শত শত মাইল দূর থেকে যে কোন জাহাজকে টেনে আনা সম্ভব হয়।

বনহুরের কথায় কাফ্রী কিছুটা দমে গেলো। সে মাথা নিচু করে কিছু ভাবছে ঠিক ঐ মুহূর্তে অপর একজন অনুচর এসে জানারো গোয়েন্দা বিভাগের জাহাজখানা এদিকেই আসছে ওস্তাদ।

বনহুর বললো—তাই নাকি।

হাঁ ওস্তাদ।

কাফ্রী?

বলুন ওস্তাদ?

মোটেই বিলম্ব করা উচিৎ নয় এই মুহূর্তে তুমি যাও। মনে রেখো অত্যন্ত সাবধানে কাজ করতে হবে।

কাফ্রীর মুখ বিবর্ণ হয়ে আসে, কিন্তু সর্দারের কথা অমান্য করতে পারে না। কাফ্রী দ্রুত পোশাক পাল্টাতে চলে যায়।

বনহুর বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দাঁড়ায় ডেকের একপাশে সুউচ্চ একস্থানে। চীনা পুলিশ বাহিনী কম নয়। বনহুরকে এবার পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সত্যই জলদস্যু সর্দারের ভূমিকা অবলম্বন করতে হবে। যেমন করে হোক রক্ষা করতে হবে এ জাহাজখানাকে। কারণ না হলে জলদস্যু সর্দার হিসাবেই তাকে বন্দী হতে হবে চীনা পুলিশ বাহিনীর হাতে। কিছুতেই তারা তাকে মুক্তি দেবে না বা বিশ্বাস করবে না সে জলদস্যু নয়।

বনহুর যখন মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করছিলো জাহাজখানাকে তখন কাফ্রী সাবমেরিন চালকের বেশে এসে দাঁড়ায়—ওস্তাদ চললাম?

বনহুর বললো—যাও, কিন্তু সাবধান, ঠিক মত কাজ করে ফিরে আসবে, না হলে তোমার শাস্তি পেতে হবে।

আচ্ছা ওস্তাদ। কথাটা বলে বিদায় নিয়ে চয়ে যায় কাফ্রী।

কিছুটা এগুতেই হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ সঙ্গে সঙ্গে কাফ্রী লুটিয়ে পড়ে ভূতলে।

বনহুর ফিরে তাকিয়েই দেখতে পায় কাফ্রীর দেহখানা খন্ড-বিখন্ড হয়ে গেছে। পুলিশ জাহাজ থেকে একটা মেশিন গানের গুলি এসে পড়েছে এ জাহাজখানার ডেকে।

বনহুর ছুটে যায় ক্যাবিনে।

কয়েকজন জলদস্যু সহ নিজে অস্ত্র চালাতে শুরু করে। পাল্‌টা মেশিন গানের গুলি বিনিময় চলে।

শুরু হয় যুদ্ধ।

চীনা পুলিশ বাহিনী আর জলদস্যু সে এক ভীষণ ব্যাপার। জলদস্যুদের পক্ষে রয়েছে স্বয়ং দস্যু বনহুর সেকি তুমুল লড়াই।

মেশিনগান পুনঃ পুনঃ গর্জে উঠতে লাগলো।

দু'পক্ষ থেকে অবিরাম গুলি বর্ষণ হচ্ছে।

চীন সাগরের বুকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিভূত হয়ে আসছে। গোলা বারুদের ঝলসানিতে এক-একবার বিদ্যুৎ চমকানির মত সমস্ত সাগর বক্ষ আলোকিত হয়ে উঠছে।

প্রচণ্ড আওয়াজ আর আলোর ঝলকানিতে মনে হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীটা বুঝি তছনছ হয়ে যাবে। বনহুর নিজে ভারী মেশিন গানটার পাশে দাঁড়িয়ে অবিরাম গুলি বর্ষণ করে চলেছে। যদিও সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে তবু একটি গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে না।

যতই অন্ধকার বাড়ছে ততই চীন সাগরের আকাশ লালে লাল হয়ে উঠেছে। মেশিনগান এবং কামানের গগনভেদী গর্জনে মুখর হয়ে উঠেছে চারিদিক।

পুলিশ বাহিনী শেষ পর্যন্ত কামান ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে। তবু তারা জলদস্যুদের সঙ্গে পেরে উঠছে না।

অবশ্য চীনা পুলিশ বাহিনীর কাছে এতোক্ষণ জলদস্যুরা তাদের জাহাজ নিয়ে টিকে থাকতে পারতো কিনা সন্দেহ। দস্যু বনুহুর কৌশলে অস্ত্র চালনা করে এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে জাহাজখানাকে চালানোর নির্দেশ দিয়ে পুলিশের গোলাগুলি থেকে নিজেদের রক্ষা করে চললো।

অন্ধকার যতই গভীর আকার ধারণ করলো ততই পুলিশ বাহিনীর জাহাজখানা পিছু হটতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত পুলিশ বাহিনীর জাহাজ অন্ধকারে আত্মগোপন করে সরে পড়তে বাধ্য হলো।

জলদস্যুগণ বুঝতে পারলো পুলিশ বাহিনীর জাহাজ তাদের কাছে পরাজয় বরণ করে পালাতে বাধ্য হলো।

অল্প কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শান্ত এবং নীরব হয়ে এলো চীন সাগর।

জলদস্যুদের আনন্দ আর হর্ষধ্বনিতে ভরে উঠে জাহাজের অভ্যন্তর। তারা সর্দারকে ঘিরে নানা রকম আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে। সর্দার যে এমন দক্ষতার সঙ্গে মেশিনগান চালাতে পারে এর আগে অনুচরদের জানা ছিলো না।

এমন একটা বিপদ কেটে যাওয়ায় জলদস্যুগণ সর্দারের চার পাশে নৃত্য শুরু করে দিলো।

বনহুর জাহাজটাকে সোজা উত্তর পূর্ব দিক লক্ষ্য করে চালানোর নির্দেশ দিয়ে নিজের ক্যাবিনে ফিরে এলো। পুরো কয়েক ঘন্টা অবিরাম সে একটানা ভারী মেশিনগান চালিয়ে এসেছে। ক্লান্ত দেহটা বনহুর এলিয়ে দিলো শয্যায়।

ঐ মুহূর্তে মনিমালা এবং সূর্যমুখি এসে বসলো বনহুরের দুপাশে। একটি অনুচর বড় রেকাবীতে করে নানা রকম খাবার এবং বড় এক বোতল মদ এনে রেখে গেলো।

বনহুর মনে মনে বিরক্ত বোধ করলেও সে সংযত রইলো কারণ সে এখন দস্যু বনহুর নয় সে এখন জলদস্যু সর্দার জবরু। কাজেই সূর্যমুখি এবং মনিমালা কোন ভুল করে নাই। তারা জানে তাদের সর্দার কিসে খুশি হয় এবং সে কারণেই তারা এসেছে সর্দারকে খুশি করতে। তার অনুচররাও নিয়মের ব্যতিক্রম করেনি কিছু। সর্দার ক্লান্ত হলে যা খেতো তাই তারা এনে হাজির করেছে।

বনহুর সোজা হয়ে বসলো মনিমালা এবং সূর্যমুখিকে লক্ষ্য করে বললো—যাও আজ তোমাদের ছুটি। তোমরা ইচ্ছামত মন যা চায় করতে পারো। এই নাও...কথাটা বলে রেকাবী থেকে দুটো মাংসের টুকরো তুলে নিয়ে দুজনার মুখে গুঁজে দিলো।

সূর্যমুখি আর মনিমালা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সর্দারের মুখের দিকে তারপর ওরা বেরিয়ে গেলো মন্থর গতিতে।

সর্দার তো তাদের এমন করে কোনদিন ফিরিয়ে দেয় নাই। আজকাল কি হয়েছে সর্দারের ভেবে পায় না ওরা।

সূর্যমুখি আর মনিমালা সর্দারের কেবিন থেকে বেরিয়ে আসতেই অনুচরগণ বেশ ঘাবড়ে গেলো। তারা এ ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত হলো।

জিজ্ঞাসা করলো কোরা—কি গো সূর্য চলে এলে কেনো?

জানিনা! অভিমানে মুখ ভার করে জবাব দিলো সূর্যমুখি।

মনিমালা বললো...নতুন মেয়েটা আসার পর থেকে সর্দার যেন কেমন হয়ে গেছে।

সূর্যমুখি বলে উঠে—সত্যি বলেছিস ভাই সর্দার আজকাল আমাদের কাছে ঘেষতেই চায় না। সব সময় এড়িয়ে যায়।

মনিমালা বলে—তোকে তবু আদর করে কাছে নেয় কিন্তু আমাকে একেবারে দেখতেই পারে না।

কোরা বলে উঠলো—দুঃখ করিস না মনিমালা আমরা তো আছি তোদের আদর কোনদিন কমবে না।

মনিমালা বলে—তোমরা পুরুষ জাতটাই ঐ রকম নতুন নতুন কত না আদর যত্ন করে পরে কেয়ারই করতে চায় না।

এমন সময় মাধা এসে হাজির—কি এতো গল্প হচ্ছেরে তোদের।

কোরা বলে উঠে—কি আর হবে সর্দার আজকাল সূর্যমুখি আর মনিমালাকে তেমন আদর করে না।

তাই নাকি?

হাঁ তাই তো ওরা বলছে।

তবে সুরমার আদর কিন্তু কমেনি, সর্দার ওর নাচ দেখে পাগল আর কি।

সূর্যমুখি অভিমান ভরা গলায় বলে...আমরা তো আর নাচর্তে জানি না, সুরমা নাচতে জানে তাই সর্দার ওকে ভালবাসে। তাছাড়া ঐ নতুন মেয়েটার জন্য সর্দার এখন ব্যস্ত।

কোরা বলে উঠে—মাধা সর্দার মনিমালা আর সূর্যমুখিকে যখন বিদায় করেছে তখন হয় সুরমা নয় নতুন মেয়েটার ডাক পড়বে।

মাধা বলে উঠে—ডাক পড়বার আগেই ওকে পৌছে দিয়ে আয় না ভাই।

ঠিক বলেছিস সব কথা কি আর সর্দার মুখে বলবে। আজকাল সর্দার কথা খুব কম বলে। দেখিস না দরকার না পড়লে কথাই বলতে চায় না। কেমন যেন সব সময় নিজের ক্যাবিনে বসে থাকতে ভালবাসে।

যাক ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইনা। চল্ নতুনকে দিয়ে আসি। বললো কোরা।

মনিমালা রাগে গস্ গস্ করে বললো—তোমরাই সর্দারের মাথাটা খেয়েছো।

বললো সূর্যমুখি—ঐ মেয়েটাকে না আনলে সর্দার অমন বিগড়াতো না বুঝলে? যত দোষ তোমাদের।

হোক, সর্দারকে খুশি করাই আমাদের কাজ। বলে উঠে দাঁড়ালো মাধা।

কোরা বললো—আজ দেখলে তো সর্দার যদি ঠিকমত যুদ্ধ চালাতে না পারতো তাহলে নির্ঘাৎ পুলিশ বাহিনী আমাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতো। ভাগ্যিস সর্দার মেশিনগান থেকে অবিরাম গুলি চালিয়ে ওদের কাবু করতে পেরেছিলো তবেই না রক্ষা পেলাম।

মাধা বলে—নে চল চল নতুনকে দিয়ে আসি।

সূর্যমুখি আর মনিমালা বাঁকা চোখে তাকায় ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে।

বনহুর সবেমাত্র বিশ্রামের জন্য বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। এ মুহূর্তে তার শরীরে কোন ছদ্মবেশ নেই। কারণ সে ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে ভালভাবে ক্যাবিনের কোন জানালাও উন্মুক্ত নেই কাজেই বনহুর নিশ্চিন্ত। এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়ে।

বনহুর বিরক্ত হয় তবু সে দরজা খুলে দেয় অবশ্য দরজা খুলবার পূর্বেই সে আলো নিভিয়ে দেয়।

কোরা আর মাধা হুসানাকে ঠেলে দিলো সেই ক্যাবিনের মধ্যে তারপর বললো মাধা—ওস্তাদ নতুন মেয়েটাকে দিয়ে গেলাম।

কোরা আর মাধা হুসনাকে ঠেলে দিতেই হুসনা অন্ধকারে ক্যাবিনের মধ্যে কারো গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। বলিষ্ঠ দুটি বাহু ধরে ফেললো তাকে।

হুসনার সমস্ত দেহখানা বলিষ্ঠ দুটি বাহুর ছোঁয়ায় শিহরিত হলো। বনহুর ওকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে অন্ধকারেই দরজা বন্ধ করে দিলো তারপর সুইচ টিপে আলো জ্বালালো।

সঙ্গে সঙ্গে হুসনা তাকালো বনহুরের মুখের দিকে, একি দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো হুসনার। যদিও সেদিন ওকে সে দেখেছিলো খানিকটা তবু এমন স্বাভাবিকভাবে নয়। অপূর্ব পৌরুষ দীপ্ত একটি মুখ।

হুসনাকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে বলে বনহুর—কি দেখেছেন?

লজ্জায় তাড়াতাড়ি দৃষ্টি নত করে নিয়ে বলে হুসনা—না কিছু না।

বনহুর বলে—বুঝেছি আপনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন আমি কেমনভাবে আত্নগোপন করে এদের সর্দার হয়ে বসে আছি। আপনাকে তো আগেই বলেছি আমি এবং আপনি একই জাহাজের যাত্রী ছিলাম। আমরা উভয়েই জলদস্যুদের বন্দী......

এবার হুসনা কথা বলে—আমি শুনেছি আপনিই যুদ্ধ করে পুলিশ জাহাজকে হটিয়ে দিয়েছেন। কেনো এ কাজ করলেন আপনি? পুলিশ জাহাজ যদি জল দস্যুদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হতো তাহলে আমরা বেঁচে যেতাম। পুলিশগণ নিশ্চয়ই আমাদের উদ্ধার করতো।

বনহুর সোফা দেখিয়ে বললো—বসুন।

নিজেও বসে পড়লো একটি সোফায়।

হুসনা তখন বসে পড়েছে জড়োসড়ো হয়ে। সংকুচিত তার মুখোভাব। মাঝে মাঝে সে লজ্জা নত দৃষ্টি তুলে তাকাচ্ছিলো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে কয়েক মুখ ধোয়া ত্যাগ করে বললো—আপনি যা বললেন মিস হুসনা তা সত্য। কিন্তু পুলিশ বাহিনী কিছুতেই বিশ্বাস করতো না—আমি জলদস্যু সর্দার নই। তবে আপনি উদ্ধার পেতেন এ সুনিশ্চয়। মিস হুসনা আপনাকে আমি কিছু সময় কষ্ট দেবো।

কষ্ট। নানা আপনি আমার হিতাকাঙ্খী আমি জানি।

হাঁ, এ বিশ্বাস আপনি আমার উপর রাখবেন কেমন! মিস হুসনা আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে ঠিক্ আপনার বাবা মার কাছে পৌছে দেবো। আপনি ভরসা হারাবেন না কোন সময়।

হুসনার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো কৃতজ্ঞতায়। অল্পক্ষণেই ফোটা ফোটা অশ্রু ঝরে পড়লো তার গন্ডবেয়ে।

বনহুর হুসনার দিকে ফিরে তাকাতেই আশ্চর্য হলো, সোজা হয়ে বসে বললো আপনি কাঁদছেন মিস হুসনা।

আঁচলে চোখ মুছলো হুসনা।

বনহুর বললো—জানি আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে। তবে আমি অনুচরদের সবাইকে বলে দিয়েছি কেউ যেন আপনার প্রতি কোন অসৎ ব্যবহার না করে।

জানি আর জানি বলেই আজও আমি আত্নহত্যা করিনি।

আত্মহত্যা! আত্মহত্যা করবেন আপনি?

বলুন এ জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে কি লাভ হবে! কি লাভ হবে বাবা মার কাছে ফিরে গিয়ে? ফুপিয়ে কেঁদে উঠে হুসনা।

বনহুর বলে—আবার আপনি অবুঝ হলেন মিস হুসনা। যা ঘটে গেছে তা তো আপনার ইচ্ছাকৃত নয়। সেজন্য আপনি দায়ী বা দোষীও হতে পারেন না। আপনার বাবা মা আপনাকে ফিরে পেয়ে যারপর নাই খুশি হবেন। মেয়েদের ধর্ম বিয়ে করা। আপনি বিয়ে করে সুখী এবং সুন্দর জীবন উপভোগ করবেন।

না না তা হয়না আমি পারবো না কাউকে ঠকাতে। আমার এ পাপ জীবন নিয়ে কারো সঙ্গে আমি ছলনা করতে পারবো না।

আবার আপনি নিজেকে দোষী মনে করছেন মিস হুসনা। এ আপনার অন্যায় দুশ্চিন্তা। মিস হুসনা আপনি এবার শুয়ে পড়ুন।

না তা হয়না, আপনি আজ বড় ক্লান্ত।

একটু হেসে বললো বনহুর—আমার কথা ছেড়ে দিন।

আপনি বিছানায় ঘুমান আমি সোফায় বসে আছি।

তা হয়না মিস হুসনা আপনিই ঘুমান।

হুসনা বলে উঠে—জানিনা আপনি কে। এতো মহৎ আপনি কোন অজানা অচেনা পুরুষের কাছে মেয়েরা কোনদিন নিরাপদ নয় কিন্তু আপনার কাছে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ রয়েছি......একটু থেমে বলে—কি বলে যে আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো ভেবে পাইনা।

মিস হুসনা আমি মেয়েদের যতই দেখেছি ততই বিস্মিত হয়েছি সত্যি মেয়েরা অদ্ভূত এক সৃষ্টি। পুরুষদের কাছে মেয়েরা সব সময় নিজেকে দুর্বল বলে মনে করে। কিন্তু কেন মেয়েদের এই দুর্বলতা বলুন তো? কেন আপনারা কি মানুষ নন? পুরুষ মানুষ যেমন তেমনি নারী জাতি।

হুসনা বললো—আপনি মহান তাই একথা আপনি বলতে পারছেন। আপনার কাছে হয়তো পুরুষ নারী সমান মর্যাদার অধিকারী কিন্তু সব জায়গায় নয়। একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো জবাব দেবেন?

বলুন দেবো?

আপনি কে? কি আপনার পরিচয়? যদি বলতে কোন আপত্তি না থাকে......

নিশ্চয়ই বলবো—আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমার কাজ ব্যবসা করা এবং সে কারণেই আমি জিয়াংহায় এসেছিলাম।

কিন্তু আপনাকে ব্যবসায়ী বলে মনে হয় না।

আপনার ধারণা?

আপনি হয়তো বা কবি সাহিত্যিক বা......

বলুন?

—কোন শিল্পী।

এ সবের কোনটাই আমি নই মিস হুসনা। তবে এবার শুনুন—ব্যবসা আমার নেশা নয় বা পেশা নয়। বাধ্য হয়ে ব্যবসা করি। নাম আমার মনির চৌধুরী। তবে যে কয়েকদিন আমরা এ জাহাজে কাটাবো আমাকে আপনি মনির বলেই ডাকবেন।

হুসনা হেসে বললো—যদি শেষ অংশই বেছে নেই।

বেশ তাও ভাল যা আপনার খুশি তাই বলে ডাকবেন। নিন শুয়ে পড়ুন এবার বিছানায় গিয়ে।

না ঘুম আমার আসছে না। আপনি বিছানায় শোন আমি জেগে থাকবো।

জেগে থাকবেন কিন্তু কেনো?

বলেছি ঘুম পাচ্ছে না।

বেশ জেগে থাকুন, আমি ঘুমাবো। বনহুর বিছানায় দেহটা এলিয়ে দেয়।

হুসনা বসে থাকে সোফায়।

রাত বেড়ে গভীর হয়ে আসে।

হুসনা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় এগিয়ে আসে বিছানার পাশে।

অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে বনহুর।

হুসনা বনহুরের শিয়রে বসে আলগোছে হাতখানা রাখে বনহুরের মাথায়। একটু একটু করে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

ঘুম ভেঙ্গে যায় বনহুরের চোখ মেলে তাকায় বলে—আপনি!

আপনি ঘুমান মিঃ চৌধুরী আমি আপনার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

কষ্ট হচ্ছে না আপনার!

না।

সত্যি মেয়েদের সহিষ্ণুতা লক্ষ্য করে আমি মাঝে মাঝে অভিভূত হয়ে পড়ি। আমি ঘুমাবো আর আপনি......

কথা না বলে ঘুমান আমি বেশি খুশি হবো।

বেশ তাই হোক।

বনহুর চোখ বন্ধ করলো।

হুসনা বনহুরের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লো বনহুর।

হুসনাও এক সময় পাশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোরে ঘুম ভেংগে যেতেই হুসনা লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে যায়। একি সে ওর বিছানায় এমনভাবে শুয়ে আছে ছিঃ ছিঃ কি ভাববে মনির চৌধুরী।

হুসনা উঠে এসে দাঁড়ায় ওপাশের মুক্ত শার্শী দিয়ে তাকায় সাগর বক্ষে। সীমাহীন জলরাশি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে হুসনা।

এমন সময় পিছনে এসে দাঁড়ায় বনহুর। দু'চোখে তখনও ঘুমের আবেশ। চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু করছে কিছুটা লালও বটে। হঠাৎ কেউ দেখলে নিশ্চয়ই মনে করবে কতনা নেশা করে সে। হুসনাকে লক্ষ্য করে বলে বনহুর—কি দেখছেন অমন করে।

হুসনা চমকে ফিরে তাকায়, অস্ফুট কণ্ঠে বলে—আপনি!

হাঁ।

ঘুম হলো?

হয়েছে।

আর একটু ঘুমালেই পারতেন মিঃ চৌধুরী।

না হঠাৎ আমার অনুচররা এসে পড়তে পারে তাই নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারলাম না। মিস হুসনা?

বলুন?

আমার ক্যাবিনে আপনাকে রাত কাটাতে হচ্ছে এতে কোন অসুবিধা বোধ করছেন না তো?

মিঃ চৌধুরী আপনি মহান, কি বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো সে ভাষা আমার জানা নেই। এই অথৈই সাগরে জলদস্যুদের জাহাজে আপনি যে আমার ভরসা।

জানি না মিস হুসনা আপনাকে শেষ পর্যন্ত জলদস্যুদের কবল থেকে সসম্মানে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো কিনা। তবে যতক্ষণ আমি জীবিত আছি ততক্ষণ আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

❑

মনিমালা এসে দাঁড়ালো পিছনে সূর্যমুখি। উভয়ের চোখে মুখেই একটা ক্রোধের ভাব বিরাজ করছে।

হুসনা বসেছিলো নিজের ক্যাবিনে। আজ তার মুখোভাব প্রসন্ন, মনে তার আনন্দ উচ্ছ্বাস। সে যে জলদস্যুদের জাহাজে আটক আছে এক কথা ভুলে গেছে যেন। রাত এবং সকালের স্মৃতিগুলো তার হৃদয়ে এক অনাবিল খুশির উৎস বয়ে আনছিলো। অকুল সাগরে যে মানিকের সন্ধান পেয়েছে। মানিকের চেয়েও অমূল্য তার কাছে মনির চৌধুরী। সকালে ওর কথাগুলির প্রতিধ্বনি জাগছিলো তার কানের কাছে...মিস হুসনা আপনাকে আমার ক্যাবিনে রাত কাটাতে হচ্ছে এতে কোন অসুবিধা বোধ করছেন না তো। নিজের কথার প্রতিধ্বনি জাগে...মিঃ চৌধুরী আপনি মহান কি বলে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো সে ভাষা আমার জানা নেই। এই অথৈ সাগরে

জলদস্যুদের জাহাজে আপনি আমার ভরসা। ওর কথাগুলো ভেসে উঠে এবার—জানিনা মিস হুসনা আপনাকে শেষ পর্যন্ত জলদস্যুদের কবল থেকে সসম্মানে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো কি না। তবে যতক্ষণ আমি জীবিত আছি ততক্ষণ আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত...

হুসনার চিন্তাধারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, মনিমালা তার দেহে ধাক্কা দিয়ে বলে উঠে—কি ভাবছো মেয়ে আজ যে বড় খুশি খুশি লাগছে তোমাকে। বলি সর্দারকে বশ করে নিলে একেবারে?

হুসনা ধাক্কা খেয়েই উঠে দাঁড়িয়ে ছিলো। এবারে সে অসহায় করুণ চোখে তাকালো মনিমালা তারপর সূর্যমুখির দিকে।

সূর্যমুখি বলে উঠলো—তুমি মনে করোনা চিরদিন সর্দার তোমার বশে থাকবে। যে ক'দিম রস আছে সেই ক'দিন তারপর ফেলে দেবে নারকেলের ছোবড়ার মত বুঝলে।

মনিমালা বলে উঠে—ওকে পেয়েই তো সর্দার আমাদের কথা ভুলে গেছে।

সূর্যমুখি মুখ বাঁকা করে বলে—আজ সর্দারের কাছে গেলাম সর্দার তেমন করে কথাই বললো না আদর করা তো দূরের কথা।

মনিমালা বললো—এখন আদর করার মানুষ তো এসে গেছে আমরা আবার কি? শোন মেয়ে তুমি যাই করো সর্দারকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

এমন সময় সুরমা বাঈ এসে দাঁড়ায় মনিমালা কথার শেষ অংশ তার কানে গিয়েছিলো বললো সে, ওর কি দোষ সব দোষ কোরা আর মাধার। ওরাইতো সর্দারকে খুশি করবার জন্য ওকে ধরে এনেছে ঐ জাহাজ থেকে।

সূর্য মুখি বলে উঠে—সুরমা তুই তো বলবিই তোর আদর তো কমেনি। রোজ একবার করে সর্দার তোর নাচ দেখে বাহবা দেয় কত ফুর্তি করে তোকে নিয়ে।

সুরমার মুখ খানা গম্ভীর হয়ে পড়ে, অভিমান ভরা কণ্ঠে বলে —নাচ দেখলেই আদর করা হয়না বুঝলি সূর্য। সর্দার কোনদিন একটা ভাল কথাও বলে না আমার সঙ্গে। সব সময় দূরে দূরে সরিয়ে রাখে।

সবাই যখন সর্দারের কথা নিয়ে নানা রকম আলোচনা করছে। তখন হুসনার মনের পর্দায় ভাসছে সেই সর্দারের আর রূপ যে রূপের সঙ্গে তুলনা হয়না কারো। এক মহান দীপ্তময় পুরুষ সে। ভাবছে হুসনা সত্যি মনির চৌধুরী এতো মহৎ এতো পবিত্র। এ তো কাছে পেয়েও যে একটি নারীকেও স্পর্শ করেনি......

হঠাৎ সেই মুহূর্তে কোরা এসে দাঁড়ায় সেখানে—সূর্যমুখি তোমরা সবাই এখানে। যাও যাও সর্দার আসছে নতুন-এর সঙ্গে দেখা করতে।

মুহূর্তে ওদের তিনজনের মুখ কালো হয়ে উঠলো। একবার ক্রোধভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো তিনজন হুসনার দিকে তারপর বেরিয়ে গেলো।

কোরা বললো—আসুন ওস্তাদ!

জলদস্যু সর্দারের বেশে প্রবেশ করলো বনহুর হুসনার ক্যাবিনে।

হুসনা যেই মাত্র শুনেছিলো সর্দার আসছে সেই ক্যাবিনে তখন তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে অপূর্ব এক অনুভূতি নাড়া জাগিয়ে ছিলো। আনন্দ উচ্ছাসে বুকটা কেমন টিপ টিপ করছিলো তার।

সর্দার ক্যাবিনে প্রবেশ করেই হুসনার দিকে তাকালো। হুসনাও তাকালো সর্দারের মুখের দিকে। সর্দারের মুখের অর্ধেক কালো কাপড়ে ঢাকা, মাথায় বিরাট আকারের পাগড়ী।

হুসনার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলো সর্দার।

হুসনা দৃষ্টি নত করে নিলো।

সর্দার কোরাকে লক্ষ্য করে বললো—তুমি যাও।

কোরা বেরিয়ে গেলো।

সরে এলো বনহুর হুসনার পাশে, চাপা কণ্ঠে বললো—মিস হুসনা আজ আপনাকে অভিনয় করতে হবে! আমার অনুচররা ধরেছে আপনাকে নিয়ে ওরা আনন্দ করবে আমার নিষেধ ওরা শুনবে না কাজেই আপনি এ ব্যাপারে প্রস্তুত থাকবেন।

কথাটা শুনে শিউরে উঠে হুসনা, ফ্যাকাশে মুখে তাকায় সে বনহুরের মুখে।

বনহুর বুঝতে পারে ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেছে হুসনা তাই বলে আবার সে—আপনি ঘাবড়াবেন না আমি তো রয়েছি...কথাটা বলে বেরিয়ে যায় বনহুর।

হুসনা নির্বাক পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

❑

সর্দারের আসনে সর্দার উপবিষ্ট।

তার চার পাশ ঘিরে জলদস্যুরা নানা রকম ফুর্তি আমোদ আহ্লাদ করে চলেছে। সূর্যমুখি আর মনিমালা বসে আছে সর্দারের দু'পাশে।

সুরমা নেচে চলেছে।

ক্যাবিনের মাখখানে একটা বড় টেবিলে নানরকম মদের বোতল আর কাঁচ পাত্র। যে যেমন পারছ ঢেলে খাচ্ছে আর আবোল তাবোল প্রলাপ বকছে।

সূর্যমুখি আর মনিমালাও সারাব পান করে ডগমগ, ওরা হেলে দুলে পড়ছে সর্দারের গায়ে। কখনও বা গেলাস ভর্তি করে এগিয়ে ধরছে তার মুখের কাছে।

সবাই সারাব পানে মাতোয়ারা ঐ সময় কোরা মাথা আর রাঘু এরা হুসনাকে নিয়ে আসে সেই ক্যাবিনে।

হুসনা যখন ক্যাবিনে প্রবেশ করলো তখন সূর্যমুখি সর্দারের কোলে মাথা রেখে খিল খিল করে হাস্‌ছে।

হুসনার দিকে তাকালো সর্দার।

হুসনার মুখে অত্যন্ত বিরক্তির ছাপ্ল ফুটে উঠেছে। কোরা আর মাধা হুসনাকে ধরে এনে সর্দারের গায়ে ঠেলে দিলো—নিন ওস্তাদ?

হুসনা হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় সর্দারের গায়ে । সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে ওকে তারপর পাশে বসিয়ে দেয়। জড়িত কণ্ঠে বলে—সুন্দরী লজ্জা করছো

কেনো? দেখছো না কেমন হাসি খুশি করছে। খাবে নাও একটু খাও......গেলাসটা তুলে নিয়ে সর্দার ওর মুখের কাছে ধরে।

হুসনার মুখমন্ডল গম্ভীর এবং কালো হয়ে উঠেছে। মদের তীব্র গন্ধে বমি আসছে ওর।

সর্দার হুসনাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় তারপর জড়িত কণ্ঠে বলে—তোমরা আনন্দ করো আমি আমার ক্যাবিনে যাই। চলো সুন্দরী আমার ক্যাবিনে চলো। সূর্যমনি তোমরা থাকো সকালে আবার দেখা হবে।

সূর্যমুখি-মনিমালা রাগে অভিমানে একেবারে ফুলে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে।

সর্দার হুসনার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে নিজে ক্যাবিনে।

ক্যাবিনে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়ে বনহুর।

একটানে মুখের আবরণ এবং গোঁফ জোড়া খুলে ফেলে তারপর ভ্রু দু'টো তুলে রেখে দেয় টেবিলের উপরে। ফিরে তাকায় হুসনার দিকে।

হুসনা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিলো, সে ভেবেছিলো মনির চৌধুরী সত্যি সত্যি বুঝি মদ পান করেছে এবং সত্যিই বুঝি তাকে এ ক্যাবিনে নিয়ে এলো তার উপর কোন অন্যায় আচরণ করবে বলে। যদিও সে বিশ্বাস করতে পারছিলো না মনির চৌধুরী এতো মহৎ হয়ে এতো নিচে নেমে আসবে।

বনহুর এসে দাঁড়ায় হুসনার সম্মুখে। ওর হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরে বলে মিস হুসনা ক্ষমা করুন। যা দেখেছেন বা আপনার সঙ্গে যে আচরণ আমি করেছি সব অভিনয়।

হুসনা তাকালো এবার বনহুরের মুখের দিকে দীপ্ত উজ্বল দুটি সুন্দর চোখ স্থিরভাবে চেয়ে আছে তার মুখে। অদ্ভুত মোহময় সে দৃষ্টি।

হুসনা নিজকে স্থির রাখতে পারে না বনহুরের পায়ের কাছে বসে পড়ে বলে উঠে—আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম তার জন্য আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।

মিস হুসনা এ আপনি কি করছেন? তাড়াতাড়ি বনহুর হুসনাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়।

হুসনা মুখ গুজে বনহুরের বুকে—বলুন ক্ষমা করেছেন।

বনহুর মুহূর্তের জন্য বিব্রত-বিচলিত-হয়ে পড়ে।

ওকে চটকরে পারেনা সরিয়ে দিতে একটা গভীর অনুভূতি তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়। বনহুর হুসনার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—আপনি কোন অন্যায় করেননি কেন ক্ষমা চাইছেন বলুন তো?

না আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম মিঃ চৌধুরী জীবনে বহুলোক আমার চোখে এসেছে-কিন্তু আপনার সঙ্গে তুলনা হয়না কারো।

মিস হুসনা আপনি অযথা বাড়িয়ে বলছেন, কি এমন করেছি...

যা করেছেন তা অনেকেই পারেনা বা করেনা। আপনি আমাকে নিঃসঙ্গ একা পেয়েও কোন মুহূর্তে অসংযত আচরণ করেননি। একি আপনার চরম মহত্বের পরিচয় নয়?

আপনি যা মনে করেন। কথাটা বলে বনহুর শয্যায় এসে বসে।

হুসনা বেরিয়ে যাবার জন্য ক্যাবিনের দরজার দিকে পা বাড়ায়।

বনহুর বলে আপনি এ ক্যাবিনেই থাকবেন কারণ রাতে বাহিরে বের হওয়াটা এ জাহাজে আপনার জন্য নিরাপদ নয়।

হুসনা না বেরিয়ে সোফায় বসে পড়ে।

বনহুর উঠে বাথরুমে প্রবেশ করে এবং কিছু পর জলদস্যু সর্দারের ড্রেস পাল্টে বেরিয়ে আসে যদিও সে পূর্বেই গোঁফ ভ্রু এবং মাথায় বিরাট আকার পাগড়ী খুলে ফেলেছিলো এখন সে স্বাভাবিক পোশাক পরেছে। ক্যাবিনে প্রবেশ করে আংগুল দিয়ে চুলগুলো আচড়ানের মত করে গুছিয়ে নিচ্ছিলো।

এমন সময় একটা শব্দ শোনা যায়। শব্দটাকে মেঘ গর্জনের মত বলে মনে হয়।

হুসনা বলে উঠে—এ কিসের শব্দ?

বনহুর একটু ভেবে বলে—ঠিক বুঝতে পারছিনা তবে মনে হচ্ছে ঝড়ের পূর্বে সমুদ্রে এরকম শব্দ শোনা যায়। যদি আমার অনুমান সত্য হয় তাহলে আমরা বিরাট এক বিপদের সম্মুখীন হতে যাচ্ছি মিস হুসনা।

শব্দটা ক্রমান্বয় আরও স্পষ্ট এবং মেঘ গর্জনের মত শোনা যাচ্ছে।

বনহুর তাড়াতাড়ি ক্যাবিনের পিছনের শার্শী খুলে তাকালো বাহিরের আকাশের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো সমস্ত আকাশ জমাট মেঘে ভরে উঠেছে সেকি ভীষণ অন্ধকার আর ভীষণ আওয়াজ। এক সঙ্গে যেন শত শত মেঘ গর্জন করে এগিয়ে আসছে তাদের জাহাজের দিকে।

বনহুর বললো মিস হুসনা আমরা নতুন এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। সাইক্লোনের কবলে পড়েছি আমরা।

হুসনা সাইক্লোনের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পড়েছি, লোকের মুখে শুনেছি, কিন্তু নিজে কোন দিন উপভোগ করেনি। শিউরে উঠলো হুসনা বিবর্ণ মুখে বললো এখন কি হবে মিঃ চৌধুরী।

বনহুর বললো—একমাত্র খোদা ছাড়া কোন উপায় নাই। মিস হুসনা, সমস্ত জলদস্যুগণ নেশাপান করে একেবারে ভম হয়ে আছে। এতো শব্দেও কারো সাড়া নেই?

তবু আপনি এ পোশাক ত্যাগ করে জলদস্যু সর্দারের পোশাক পরে নিন মিঃ চৌধুরী না হলে ওরা এসে পড়তে পারে তখন এক বিপদে আর এক বিপদ ঘটবে। মিঃ চৌধুরী আপনার যদি কোন বিপদ ঘটে তাহলে আমি বাঁচবোনা। যান, যান আপনি......

বনহুর পোশাক পালটে নেওয়ার জন্য পাশের ছোট ক্যাবিনে প্রবেশ করে।

ঐ সময় জলদস্যুদের ক্যাপটেন এসে দাঁড়ায়—ওস্তাদ ওস্তাদ...

ক্যাবিনের দরজা খুলে দেয় হুসনা।

ক্যাপটেন বলে উঠে—ওস্তাদ কোথায়?

আছে।

ঐ মুহূর্তে বেরিয়ে আসে বনহুর তার পোশাক পালটানো হয়ে গেছে বলে বনহুর—ক্যাপটেন এ কিসের শব্দ?

ক্যাপটেন ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠে—সামুদ্রিক ঝড় শুরু হয়েছে সর্দার আর রক্ষা নাই! ঝড়ের বেগ এতো বেশি বেড়ে গেছে যে কিছুতেই জাহাজ খানাকে নাবিকগণ ঠিকভাবে চালাতে পারছেনা...

জাহাজখানা তখন ভীষণভাবে দুলতে শুরু করেছে। প্রচণ্ড প্রচণ্ড ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ছে জাহাজের ডেকে।

তুমুল ঝড়।

ক্যাপটেন ছিটকে পড়লো ডেকের উপরে।

হুসনা ছুটে এসে আকড়ে ধরলো বনহুরকে।

বনহুর কিছুতেই স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিলোনা হুসনাকে সেও আঁকড়ে ধরলো ততক্ষণে একটা বিরাট ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো জাহাজের উপরে। বনহুর আর হুসনা উভয়ে উভয়কে জাপটে ধরে রইলো। সমস্ত শরীর ভিজে চপসে গেছে।

ততক্ষণে জাহাজে জলদস্যুদের আর্তচিৎকার ভরে উঠেছে। কে কোন দিকে ছুটে পালাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না।

একবার কানে এলো নারী কণ্ঠে আর্তচিৎকার...ওস্তাদ...ওস্তাদ ....ও...স্তা...দ...

সূর্যমুখি কিংবা মণিমালার কণ্ঠস্বর ঠিক বোঝা গেলোনা।

হুসনা বনহুরকে জাপটে ধরে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিয়েছে। কিছুতেই সে ওকে ছাড়ছেনা।

জাহাজখানা এক একবার সম্পূর্ণ কাৎ হয়ে যাচ্ছে এই বুঝি ডুবে যাবে। দিশেহারা হয়ে ছুটে যাচ্ছে জাহাজখানা এলোমেলোভাবে।

ক্যাপটেন কোন রকমে জাহাজের ইঞ্জিনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো কিন্তু তখন ইঞ্জিনে আগুন ধরে গেছে। আর রক্ষা নাই জাহাজখানা এবার তলিয়ে যেতে লাগলো।

বনহুর পূর্বেই দেখেছিলো তাদের ক্যাবিনের সম্মুখে কয়েকটি লাইফ বোট ঝুলানো আছে। বনহুর হুসনা সহ এগিয়ে গেলো এবং দ্রুত হস্তে অতি সাবধানে একটি লাইফ বোট খুলে নিলো। বললো—মিস হুসনা জাহাজখানা এই মুহূর্তে তলিয়ে যাবে আপনি খোদাকে স্মরণ করে এই রশি দেখছেন এই রশি ধরে নেমে চলুন।

আপনি?

আমি আপনার পূর্বেই নেমে যাচ্ছি হয়তো লাইফ বোটখানা উলটেও যেতে পারে তবু আপনাকে জাহাজ থেকে নামতে হবে কারণ জাহাজখানা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তলিয়ে যাবে।

বনহুরের কথাগুলো টুকরা টুকরো ভাবে শোনা যাচ্ছিলো কারণ এতো বেশি ঝড়ের বেগ ছিলো যার জন্য স্থির হয়ে দাঁড়ানোও সম্ভব ছিলোনা। হুসনা আঁকড়ে ধরলো বনহুরকে—না না আপনাকে আমি ঐ অন্ধকারময় সাগর বক্ষে নামতে দেবোনা। নামতে দেবোনা...

কিন্ত কোন উপায় নেই মিস হুসনা। আমাকে এবং আপনাকেও নামতে হবে। আসুন আমি নিচে গিয়ে রশি ধরে থাকবো। কথাটা বলে বনহুর দড়ি বেয়ে নিচে প্রচন্ড ঢেউ এর বুকে নেমে গেলো।

হুসনাও তারপর নেমে গেলো নিচে।

বনহুর বারবার চিৎকার করে বলছে—মিস হুসনা কোনক্রমে আপনি হাত খুলে দেবেন'না। সাবধানে নেমে আসুন।

হুসনা ভয়ে একেবারে যা তা হয়ে গিয়েছিলো, হাত তার আপনা আপনি শিথীল হয়ে এলো কিছুটা নামতেই দড়ি থেকে খসে পড়লো হুসনা নিচে।

বনহুর যা ভেবেছিলো তাই হলো। হুসনার ভাগ্য বলতে হবে হুসনা এসে আছড়ে পড়লো লাইফ বোট সোজা। বনহুর ধরে ফেলতে সক্ষম হলো কারণ লাইফ বোটখানা তখন একটা ঢেউ এর উপরে প্রায় জাহাজের কাছাকাছি এসে পড়ে ছিলো।

বনহুর হুসনাকে জাপটে ধরে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে, রশিখানা এক ঝটকায় খসে আসে জাহাজের রেলিং থেকে। লাইফ বোটখানাও উলটে যায় সেই মুহূর্তে।

বনহুর কিন্তু অতিকষ্টেও হুসনাকে ছেড়ে দেয় না। দক্ষিণ হস্তে লাইফ বোটখানা আঁকড়ে ধরে বাম হস্তে হুসনাকে ধরে রাখে।

সেকি প্রচণ্ড ঝড়, চারিদিকে জমাট অন্ধকার, কিছু নজরে পড়ছেনা। সামুদ্রিক ঝড় সাইক্লোন মহা ভয়ঙ্কর জিনিস। বনহুর এর পূর্বে একবার সাইক্লোনের কবলে পড়েছিলো। সেবারও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা করেছিলো

বনহুর। ভাগ্যক্রমে জীবনে বেঁচে গিয়েছিলো কিন্তু এবার সে রক্ষা পাবে কিনা সন্দেহ।

এতো বেশি এবং প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকা এক ভীষণ ব্যাপার। বনহুরের বলিষ্ঠ বাহু ও এক সময় শিথীল হয়ে এলো। ঐ মুহূর্তে সমস্ত জাহাজখানা দাউ দাউ করে জলে উঠলো।

সাগর বক্ষে তখন লক্ষ লক্ষ দানব এক সঙ্গে যেন যুদ্ধ করে চলেছে। সেকি ভয়ঙ্কর ভীষণ অবস্থা তা কেউ কোন দিন কল্পনা করতেও পারেনা।

বনহুর প্রাণ পণে আঁকড়ে ধরে থাকে হুসনাকে।

❑

একদল জেলে আর জেলেনি সমুদ্রে তাদের সঙ্গী সাথীদের সন্ধান করে ফিরছিলো। গতকাল সাইক্লোনে তাদের বহু জেলে নৌকা ডুবে গেছে। তাই জেলেরা তাদের আত্নীয় স্বজনদের খুঁজে ফিরছিলো সমুদ্রের তীরে তীরে কেউ বা নৌকা নিয়ে কেউ বা পায়ে হেটে হেটে।

জেলেরা সাইক্লোন ঝড়ের সঙ্গে পরিচিত কিন্তু এমন সাইক্লোন তারা কমই দেখেছে। এই সাইক্লোনে সাগরে কত শত শত জাহাজ ডুবেছে, কত হাজার হাজার নৌকা ডুবি হয়েছে, কত মানুষ মরেছে, কত সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই।

জেলেরা যখন নিজেদের আত্নীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবের সন্ধান করে ফিরছে তখন হঠাৎ একদল জেলের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো দূরে বালুচরের বুকে। পাশা পাশি দুটো মানুষ পড়ে আছে।

জেলেরা তাড়াতাড়ি ছুটে গেলো।

গিয়ে দেখলো সত্যি দুটো মানুষ পড়ে আছে। একটি পুরুষ একটি মেয়ে। মেয়েটার শাড়ির কিছু অংশ জড়িয়ে আছে পুরুষটির দেহের সঙ্গে। মেয়েটি উঁবু হয়ে আছে আর পুরুষটি চীৎ হয়ে।

জেলেদের মধ্যে একজন প্রবীণ জেলে বলে উঠলো—গতকাল ঝড়ে নিশ্চয়ই এরা নৌকা বা জাহাজ ডুবি হয়ে ডুবে গিয়েছিলো। দেখি এরা জীবিত আছে না মরে গেছে...জেলেটা প্রথমে পুরুষটার বুকে মাথা রেখে আনন্দ ধ্বনি করে উঠলো—বেঁচে আছে এখনও। উঠে এবার মেয়েটাকে পরীক্ষা করে দেখলো—দু'জনাই জীবিত আছে...

সবাই আনন্দ ধ্বনি করে উঠলো—হুররে...

জেলে সর্দার বললো—তোমরা হাঁ করে কি দেখছো এদের ঘরে নিয়ে চলো। তাড়াতাড়ি ওষুধ খাওয়াতে হবে।

একজন জেলে বললো—সর্দার ওরা বুঝি স্বামী স্ত্রী?

সর্দার বললো—হাঁ তাই হবে। না হলে এরা এক সঙ্গে এমনভাবে থাকবে কেনো।

আসলে পুরুষটি হলো স্বয়ং দস্যু বনহুর আর মেয়েটি হলো মিস হুসনা। তারা যখন সাগর বুকে সাইক্লোনের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছিলো তখন উত্তাল তরঙ্গে হুসনার শাড়ির আঁচলখানা জড়িয়ে গিয়েছিলো বনহুরের দেহের অপর অংশ এটে বাঁধাছিলো হুসনার কোমরে। যে মুহূর্তে হুসনা দড়ি বেয়ে জাহাজের নিচে নামতে যাচ্ছিলো ঐ মুহূর্তে সে কাপড়খানা মাজায় গিঁট দিয়ে পরে নিয়েছিলো। তাই প্রচণ্ড ঝড়েও কাপড়খানা হুসনার কোমর থেকে খসে যায়নি।

বনহুর যখন প্রচন্ড ঢেউ এর সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছিলো তখন তার এক হাতে ধরাছিলো লাইফ বোট আর অপর হাতে ধরাছিলো হুসনার দেহখানা। কখন যে কিভাবে বনহুর আর হুসনা প্রচণ্ড ঢেউ এর আঘাতে বালুচরে আটকা পড়ে গিয়েছিলো জানেনা তারা নিজেরা কেউ।

জেলেরা বনহুর আর হুসনাকে বাড়ি নিয়ে যায়। তারা নানা রকম গাছ গাছড়ার রস দিয়ে ঔষধ তৈরি করে খাওয়ায়।

সমস্ত দিন সংজ্ঞা ফিরে আসেনা বনহুর এবং হুসনার।

জেলেরা প্রাণপণ সেবা যত্ন করে চলে।

এক সময় জ্ঞান ফিরে আসে হুসনার। তখনও বনহুরের সংজ্ঞা লাভ ঘটেনি।

হুসনা চোখ মেলতেই একটা বৃদ্ধা বলে উঠে—শুয়ে থাক বেটি শুয়ে থাক্! তোর স্বামী ভাল আছে...

হুসনা বিস্মিত হয়, কিন্তু সে এতো বেশি অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো যার জন্য বেশিক্ষণ চোখ মেলে থাকতে পারে না। চোখ বন্ধ করে ভাবে কি হয়েছে তার...এখন যেখানে সে শুয়ে আছে এটা কোন জায়গা—এরাই বা কে...আর তার স্বামী...কে তার স্বামী...ধীরে ধীরে মনে পড়ে সেই ভীষণ ঝড়ের কথা। সেই জলদস্যুদের জাহাজের কথা। মনে পড়ে মনির চৌধুরীর কথা। হঠাৎ বুকটা মোচড় দিয়ে উঠে মনির চৌধুরী কি তার কাছে থেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে...

এমন সময় বৃদ্ধা এক গেলাস গরম দুধ এনে বলে—নে দুধ টুকু খেয়ে নে!

হুসনা কোন আপত্তি করতে পারলোনা, ধীরে ধীরে মাথাটা উঁচু করে দুধ টুকু খেয়ে নিলো।

বৃদ্ধা আবার ওকে শুইয়ে দিয়ে বললো—চুপ করে শুয়ে থাক। দেখি তোর স্বামীর জ্ঞান ফিরলো কিনা।

চমকে উঠলো আবার হুসনা, অস্ফুট কণ্ঠে বললো—আমার স্বামী। কে আমার স্বামী?

কোনো তোর সঙ্গে যে ছিলো? ঐ তো ও পাশের বিছানায় শুয়ে আছে। দেখবি তোর স্বামীকে?

হুসনা কিছু না বলে মাথা উঁচু করে তাকালো যে দিকে বৃদ্ধা আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলো সেই দিকে। সঙ্গে সঙ্গে হুসনার মুখখানা দীপ্ত উজ্বল হয়ে উঠলো। একি এ যে মিঃ চৌধুরী। তবে কি সেও বেঁচে আছে। হুসনা ভুলে যায় সেও অসুস্থ, উঠে পড়ে সে বৃদ্ধার কথা না শুনে।

ও পাশের একটা দড়ির খাটিয়ায় চীৎভাবে শুইয়ে রাখা হয়েছে বনহুরকে। জামাটা খুলে ফেলেছে ওরা তার দেহ থেকে। শুধু প্যান্টখানা পরা আছে। পায়েও কোন জুতো বা মুজো নাই।

হুসনা এসে দাঁড়ায় ঘাটিয়ার পাশে। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে ওর সংজ্ঞাহীন মুখমন্ডলের দিকে।

বৃদ্ধা এসে দাঁড়িয়েছে হুসনার পিছনে, ওর কাঁধে হাত রেখে সান্তনার স্বরে বলে—দুঃখ করিস না মেয়ে। তোর স্বামী মরবেনা বেঁচে যাবে...

এতো দুঃখেও হুসনার বুকটা আনন্দে আলোড়িত হয়ে উঠে। দীপ্ত উজ্জল হয়ে উঠে তার মুখখানা। সত্যি কি তার ভাগ্য এমন হবে? মিঃ চৌধুরীকে স্বামীরূপে কল্পনা করাও যে তার পাপ, কারণ সে সতীত্ব হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু যদি সে তাকে ভালই না বাসবে তবে কেনো সে জীবন দিয়ে তাকে উদ্ধার করলো? একটা অনাবিল খুশির উৎস তার শিরায় শিরায় শিহরণ জাগালো। যদিও তার শরীর এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয় তবু আনন্দে উদ্ভাসিত তার হৃদয়।

বৃদ্ধা বললো—তোর স্বামী বেঁচে আছে দেখে খুব খুশি হয়েছিস মেয়ে তাই না?

হুসনা বললো—হাঁ। অনেক খুশি হয়েছি আমি।

জানিস মেয়ে তোর স্বামী তোর আঁচলখানা শক্ত করে গায়ে পরিয়ে নিয়ে ছিলো যেনো তুই হারিয়ে না যাস্ তাই তো তোরা এক সঙ্গে ছিলি। না হলে কোথায় ভেসে যেতিস কেউ কাউকে খুঁজে পেতিস না আর।

বুড়ি মা ও বাঁচবে তো?

হাঁ বাঁচবে। ওকে অনেক ওষুধ খাইয়েছি। মরবেনা আর ও মেয়ে তুই একটু ওর পাশে বস আমি দেখি ওদিকে আবার আমার সব কাজ পড়ে আছে।

আচ্ছা তুমি যাও বুড়িমা, আমি বসছি।

তোর শরীর খারাপ কিনা...

না খারাপ লাগছে না। যদিও হুসনার কথাটা সত্য নয় তবু সে বললো।

বৃদ্ধা বেরিয়ে গেলো।

হুসনা বসলো বনহুরের পাশে। এমন ভাবে হুসনা ওকে দেখেনি কোন সময়। অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো; তারপর ধীরে ধীরে ওর মাথায় কপালে চিবুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো হুসনা।

এমন সময় ফিরে এলো বৃদ্ধা পিছনে ওর স্বামী বৃদ্ধ জেলে। হাতে এক বাটি ঔষধ হুসনা রং দেখে বুঝতে পারলো গাছ গাছড়ার রস হবে।

হুসনাকে সুস্থ অবস্থায় দেখে বৃদ্ধ খুশি হলো, বললো—মেয়ে তুই এরি মধ্যে ভাল হয়ে গেছিস?

হুসনা বললো—হাঁ বাবা আমি ভাল হয়ে গেছি। কিন্তু ওর যে এখনও জ্ঞান ফিরে এলো না?

কিছু ভাবিস না মেয়ে ওর জ্ঞান ফিরে আসবে। কিন্তু একটু দেরী হবে কারণ কি জানিস মেয়ে? ও খুব পরিশ্রম করে তোকে বাঁচিয়েছে। তুফান বড় খারাপ বুঝলি?

হুসনা বুঝতে পারে মিঃ চৌধুরী তাকে বাঁচানোর জন্যই অনেক চেষ্টা করেছে। সাইক্লোনের সঙ্গে লড়াই করেছে তবেই তাকে বাঁচাতে পেরেছে...কিন্তু কি হলো তার জীবন রক্ষা করে। এই অপবিত্র জীবন নিয়ে এমন দেব সমতুল্য পবিত্র একটি জীবন নষ্ট করবে সে কি করে।...

কি ভাবছিস মেয়ে? যা তুই বিশ্রাম করবি যা আমি ওকে এই রস খাইয়ে দিবো। দেখবি এক ঘন্টার মধ্যে ওর জ্ঞান ফিরে আসবে। জানিস মেয়ে আমরা সাগরের মানুষ—সাগরের সঙ্গে আমাদের যেমন শত্রুতা তেমনি মিতালীও আছে। এই রস দেখছিস এ রস সাগরের নিচে এক রকম গাছ গাছড়া আছে তারই। আমি নিজে গিয়ে তুলে এনেছি। ওকে খাইয়ে দিলে সব ভাল হয়ে যাবে।

হুসনা দু'চোখে কৃতজ্ঞতা নিয়ে তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধা এবং বৃদ্ধার মুখে। এই নিঃসঙ্গ অজানা অচেনা জায়গায় এরা তাদের কেউ নয় তবু এরাই যে তাদের পরম আপন জন। হুসনা গিয়ে নিজের বিছানায় বসে।

বিছানা বলতে দড়ির খাটিয়ায় একটি কম্বল বিছানো আর একটি তেলচিটা বালিশ। দড়ির খাটিয়ায় বসে বসে ভাবে হুসনা, কোন দিন যে তার পিতা মাতা ভাইবোনদের কাছে ফিরে যেতে পারবে কিনা কে জানে। হয়তো তার আব্বা কত ভাবছে, মা হয়তো কত কাঁদছে, ভাইবোনরা না জানি কত চিন্তা করছে......আজ সে কোথায়, কোন অজানা দেশে। তবু তার বুকে ভরসা মিঃ চৌধুরী আছেন তার সঙ্গে। যদি কোন দিন সে ফিরে যেতে নাও পারে তবু যদি পাশে থাকে মিঃ চৌধুরী।

হঠাৎ বৃদ্ধার আনন্দ ধ্বনি শোনা যায় মেয়ে এদিকে আয় তোর স্বামী চোখ মেলেছে। এদিকে আয়......

হুসনা তাড়াতাড়ি উঠে এগিয়ে যায়, বনহুরের খাটিয়া খানার পাশে।

সত্যি বনহুর ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাতে চেষ্টা করছে।

বৃদ্ধা জেলে বলে উঠে—দেখলি মেয়ে আমার ওষুধের গুণ দেখলি? খাইয়ে দিতে না দিতেই কেমন হুস হয়ে গেলো।

বনহুরের তখনও সম্পূর্ণ সংজ্ঞা ফিরে পায়নি, পাশ ফিরে আবার সে চোখ বন্ধ করলো।

বৃদ্ধ বললো—তুই ওর পাশে বসে থাক মেয়ে যতক্ষণ হুস না হবে ততক্ষণ সরবিনা।

আচ্ছা তাই থাকছি। বললো হুসনা।

❑

কয়েক ঘন্টা অঘোরে ঘুমালো বনহুর।

হুসনা সব সময় জেগে বসে রইলো তার শিয়রে। মাঝে মাঝে চুলে কপালে গন্ডে হাতখানা বুলিয়ে দিতে লাগলো। এমন করে সে তো এর পূর্বে কোন দিন ওকে স্পর্শ করার সুযোগ পায়নি। মনে ওর বিপুল উন্মাদনা, আর উজ্জ্বল আনন্দ ওর কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে লাগলো সে আলগোছে।

হঠাৎ হুসনার একটু তন্দ্রার মত এসেছে এমন সময় বনহুর বলে উঠে—একটু পানি। মনিরা একটু পানি দাও......

হুসনা তাড়াতাড়ি ঝুকে পড়ে বনহুরের মুখের উপর—মিঃ চৌধুরী... মিঃ চৌধুরী......ও পাশ থেকে পানির গেলাসটা নিয়ে তুলে ধরে বনহুরকে—নিন পানি খান।

বনহুর পানি খেলো কিন্তু চোখ মেললোনা বা কোন কথা বললোনা।

সমস্ত রাত সংজ্ঞা ফিরে এলোনা বনহুরের।

হুসনা অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন ছিলো তাই সে নিজেও বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারলো না। এক সময় বনহুরের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

বৃদ্ধা এবং বৃদ্ধ এসে দেখে গেলো ওরা ঘুমিয়ে আছে। তাই ওরা বিরক্ত করলো না, বেরিয়ে গেলো দরজার ঝাপ বন্ধ করে।

জেলেদের ঘরদোর সব বাঁশ আর খড় দিয়ে তৈরি ছিলো। দরজা বলতে ওদের তেমন কিছু নয় সামান্য মাপ দিয়ে তৈরি একটি ঢাকনা।

জেলেদের তেমন ঘর দরজার প্রয়োজনই বা কি? সমস্ত দিন ওরা ডিংগি নৌকা আর জাল নিয়ে সমুদ্রে পড়ে থাকে। ফিরে আসে সন্ধ্যার পর রাত টুকু ওরা কাটায় তারপর আবার সকালে সেই জাল নৌকা আর সমুদ্র।

ঘর সংসার বলতে ওদের খুব বড় একটা কিছু নেই। দু'চারটে হাড়ি পাতিল আর মাটির থালা বাসন।

কেউ কেউ মাটির মেঝেতে চাটাই বিছিয়ে শোয়, কেউ বা দড়ির খাটিয়ায়। তবে সবার ঘরে দড়ির খাটিয়া নাই। জেলে সর্দার খসরুর ঘরে দুটো খাটিয়া ছিলো। একটাতে খসরু নিজে শুতো একটাতে বুড়ি। কিন্তু দুটো ভদ্রলোকের ছেলে মেয়ে সমুদ্রে ভেসে এসেছে তাই ওরা দড়ির খাটিয়া দুটো ছেড়ে দিয়েছে দু'জনাকে। ওরা অবশ্য পাশের ঘরে মেঝেতে চাটাই বিছিয়ে শোয়।

কষ্ট ওদের হয় না, কারণ এ-সব গা সওয়া হয়ে গেছে।

সকালে হুসনার ঘুম ভাংবার পূর্বেই সংজ্ঞা ফিরে আসে বনহুরের। সে ধীরে ধীরে চোখ মেলো তাকায়। বুড়ো জেলের দেওয়া সমুদ্র তলের উদ্ভিদের রস খেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে বনহুর। তারপর একটানা ঘুম পেয়ে এখন আর কোন ক্লান্তি বা অবসাদ নেই। সুস্থভাবে তাকায় সে, হঠাৎ নজর পড়ে তার নিজের খাটিয়ার পাশে কে যেন শুয়ে আছে। বিস্মিতভাবে উঠে বসতেই হুসনার মুখে নজর পড়ে। একি হুসনা তার পাশে শোয়া......তাছাড়া দড়ির খাটিয়া......বেড়ার ঘর ......ঘরের চালা......এ সে কোথায়......কি করে সে এখানে এলো? বনহুর খাটিয়ায় সোজা হয়ে বসে, তার নিজের দেহের দিকে তাকায়, এমন খালি গা কেনো তার।

ভ্রুকুঞ্চিত করে ভাবতে থাকে। ধীরে ধীরে মনে পড়ে সব কথা। জলদস্যুদের জাহাজ......সাইক্লোন ......প্রচণ্ড প্রচণ্ড ঢেউ......মেঘের গর্জনের মত ভয়ঙ্কর শব্দ......তারপর সমুদ্র বক্ষে লাইফবোট......হুসনাকে নিয়ে প্রাণ পনে ভেসে থাকার চেষ্টা......বনহুরের চোখ দুটো নেমে আসে হুসনার মুখে, কি করে সে এবং হুসনা বেঁচে আছে এবং একই সঙ্গে আছে ভেবে পায় না!

হুসনা অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

বনহুর খাটিয়া থেকে নেমে দাঁড়ায় নিচে। এগিয়ে চলে দরজার দিকে। ঝাপ সরিয়ে বেরিয়ে আসতেই বৃদ্ধ জেলে আর জেলে বুড়ি আনন্দে উচ্ছল হয়ে এগিয়ে আসে। বুড়োবুড়িকে লক্ষ্য করে বলে— দেখলে আমি বলেছিলাম—ঐ ওষুধ খেলে এক ঘুমে বাবু সেরে উঠবে। দেখিল তো সত্যি কিনা? বাবু এখন কেমন লাগছে তোর?

বনহুর কিন্তু অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলো বুড়ো জেলের মুখে, ওর কথাগুলো শুনছিলো সে মনোযোগ সহকারে। অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলো এই বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা তাদের জীবন রক্ষা। নিশ্চয়ই এরা তাদের কোন রকমে উদ্ধার করে এনেছে।

বনহুর বললো—এখন বেশ ভাল লাগছে।

বৃদ্ধা বলে উঠে—বাবু বৌ এর বুঝি ঘুম ভাংগেনি?

বনহুর মনে মনে বললো—বৌ-কে বৌ-কার কথা বলছে এরা পরক্ষণেই বুঝতে পারলো এরা হুসনাকে তার বৌ বলে মনে করে নিয়েছে। এতো দুঃখেও হাসি পেলো বনহুরের, বললো—না ওর ঘুম ভাংগেনি।

অল্পক্ষণেই তার চার পাশে এসে জড়ো হলো অনেক জেলে পরিবার তাদের বৌ-ছেলে মেয়ে সবাই তাকে ঘিরে ধরে অবাক হয়ে দেখছে।

বৃদ্ধা বললো—তোরা বাবুর কি দেখছিস যা যা ভাগ সবাই।

বৃদ্ধ ও স্ত্রীর কথায় যোগ দিয়ে বললো—হা করে কি দেখছিস সব। যা বাবুর জন্য খাবার নিয়ে আয়।

একজন বললো—বাবুকে আমরা দেখতে এসেছি।

অপর একজন বললো—বাবু এখন সেরে গেছে?

বৃদ্ধা বললো—সারবেনা আমার ওষুধ কম মনে করেছিস। মরা মানুষ জ্যান্ত হয় বুঝলি?

বৃদ্ধা বলে—বুড়ো তুই গাই দুয়ে দে বাবুকে দুধ গরম করে দিবো।

হাঁ তাই কর। হাঁড়ি নিয়ে যায়......ওরে হাল্লু গাই নিয়ে আয় বাছুর নিয়ে আয়......

বনহুর পুনরায় ফিরে যায় কুঠিরের মধ্যে।

তখনও হুসনা ঘুমাচ্ছে।

বনহুর একটু হাসে, বৃদ্ধার কথাটা ওর কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—বাবু বৌ-এর ঘুম ভাংগেনি বুঝি? বৌ—ওরা মনে করেছে হুসনা বৌ, দোষ কি ওদের। ওরা তো আর জানেনা কে সে আর মেয়েটাই বা কে। বনহুর হুসনার কানের কাছে ঝুকে ডাক দেয়—মিস হুসনা। মিস হুসনা!

হুসনা চোখ মেলে তাকিয়েই বনহুরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠে আনন্দে ঝলমল করে উঠে ওর চোখ দুটো। সোজা হয়ে বসে অসংযত কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে বলে—কেমন আছেন মিঃ চৌধুরী?

বনহুর হুসনার পাশে বসে বলে—দেখতেই পাচ্ছেন সম্পূর্ণ সুস্থ।

হুসনা শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায় তারপর—বলে আপনার জন্য বড় দুশ্চিন্তায় ছিলাম। যাক এবার জামাটা পরে ফেলুন দেখি। হুসনা ওদিকের দড়িতে বিছিয়ে রাখা জামাটা এনে বনহুরের হাতে দেয়।

বনহুর বুঝতে পারে তার দেহ থেকে জামাটা খুলে শুকোতে দেওয়া হয়েছিলো। জামাটা হাতে নিয়ে পরতে থাকে।

জামাটা পরা শেষ করে বলে বনহুর—মিস হুসনা, এখনও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমরা বেঁচে আছি কি করে? এবং দু'জন এক সঙ্গেই আছি......

হুসনার মুখে একটা চিন্তার ছাপ ফুটে উঠে বলে সে—ঠিক আমিও বুঝতে পারিনি মিঃ চৌধুরী। তবে এদের কথা বার্তায় বোঝা যায় আমার

শাড়িখানা আপনার দেহের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলো এবং সেই অবস্থাতে এরা আমাদের দু'জনাকে সমুদ্র তীরে কুড়িয়ে পায়।

হাঁ বাবু, মেয়ে যা বললো তাই ঠিক। আমরা তোকে এবং বৌকে সমুদ্র তীরে কুড়িয়ে পেয়েছি। তোদের দেখে বাড়ি নিয়ে এসেছি। তোদের কষ্ট হচ্ছে বাবু? কথাগুলো এক সঙ্গে বললো বৃদ্ধ জেলে খসরু।

বনহুর হেসে বললো—বুড়ো বাবা আমরা খুব ভাল আছি। তুমি আমাদের বাড়ি বয়ে না আনলে আমরা নিশ্চয়ই মরে যেতাম।

এমন সময় জেলে বুড়ি দু'বাটি গরম দুধ এনে খেতে দেয়; বাবু আর হুসনাকে। বলে—নে বাবু তুই আর বৌ খেয়ে নে।

বনহুর দুধের বাটিটা হাতে তুলে নিয়ে মৃদু হেসে বলে—বৌ নাও।

হুসনা বৃদ্ধার কথা শুনে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিলো এবার সে আরও লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

জেলে বুড়ি বলে—লজ্জা করছিস মেয়ে। তোরা খা, আমরা যাচ্ছি। বুড়োকে লক্ষ্য করে বলে—আয় আমরা যাই।

চল বুড়ি চল ওরা খাক।

বেরিয়ে যায় জেলে বুড়ি আর বুড়ো।

বনহুর হেসে বলে—মিস হুসনা ওরা অবুঝ সরল মানুষ তাই ভুল করেছে। আমি ওদের হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

হুসনার গন্ড রক্তাভ হয়ে উঠে, লজ্জায় মাথা নিচু করে বেরিয়ে যায় সে।

☐

বনহুর একদিন বলে—বুড়ো বাবা এমন করে বসে বসে আর কতদিন খাবো—একটা জাল দাও তোমাদের সঙ্গে মাছ ধরতে যাবো।

জেলে আর জেলে বুড়ি যেন আকাশ থেকে পড়ে। অবাক হয়ে বলে জেলে বুড়ো খসরু—বাবু এ তুই কি বলছিস মাছ ধরতে যাবি আমাদের সঙ্গে?

হাঁ বুড়ো বাবা। বলে বনহুর।

বুড়ি বুড়ো এক সঙ্গে বলে উঠে—না তা হবে না।

বনহুর বলে—কেনো? কেনো হবে না?

এ সব কাজ কি তোরা করেছিস কোনদিন যে পারবি। আমরা থাকতে তোকে আর বৌকে কিছু ভাবতে হবে না। মাছ মারি কোন তো অভাব নাই আমাদের। কথাগুলো বলে হাসে জেলে বুড়ো তারপর আবার বলে—আমাদের ছেলে মেয়ে কিছু নাই। যা কামাই করি পাড়া প্রতিবেশীদের নিয়ে মিলে মিশে খাই। না হয় তোরা খেলি? বলে চলে যায় বুড়ো এবং বুড়ি।

হুসনাও শুনছিলো ওদের কথাগুলো।

বনহুর তাকালো হুসনার দিকে, বললো—দেখলেন গরিব হলেও এরা কত মহৎ। কত বড় উদার এদের মন।

কিন্তু পারে না বনহুর এমন করে চুপ চাপ সময় কাটাতে। প্রতিদিন সকাল এবং বৈকাল সমুদ্রের ধারে দিয়ে বালুচরে বসে বসে তাকিয়ে থাকে সমুদ্রের দিকে। হঠাৎ যদি কোন জাহাজ এসে পড়ে এদিকে, তাহলে হয় তো তারা ফিরে যেতে পারত—না হলে এখান থেকে ফিরে যাবার কোন উপায় নাই। বনহুর কয়েক দিনের মধ্যেই জানতে পেরেছে—যেখানে তারা এখন আছে সেটা একটা অজানা অচেনা দ্বীপ। এ দ্বীপের নাম কুন্দল দ্বীপ।

এ দ্বীপে সভ্য মানুষ না থাকলেও জেলেরা আছে এরা কিছুটা সভ্য। আর অন্যান্য কিছু লোক বাস করে এরা সম্পূর্ণ অসভ্য ধরণের। এরা সভ্য মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে জানে না। এরা অত্যন্ত সাহসী এবং ভয়ংকর।

একদিন বনহুর জেলে বুড়োর কাছে এদের গল্প শুনেছে। এরা এ দ্বীপের পূর্ব দিক অধিকার করে নিয়ে আছে। তবে মাঝে মাঝে হঠাৎ আচমকা ওরা

এসে জেলেদের উপর আক্রমণ চালায় তখন যুদ্ধ হয়। জেলেরাও কম সাহসী নয়। তারাও অসভ্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। হতাহত হয় উভয় পক্ষে।

এসব এদের গা সওয়া তাই এরা এ সব নিয়ে তেমন করে মাথা ঘামায় না। মাছ ধরে জমি আছে ফসল বোনে, খায় ঘুমায় এই এদের কাজ।

এ দ্বীপে কোন জাহাজ আসে না তাই এরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে পরিচিত নয়। অবশ্য এ দ্বীপে জাহাজ না আসার কারণ আছে, জেলে বুড়োর কাছেই বনহুর জেনে নিয়েছে। এ দ্বীপের চারদিকে নাকি বহু ডুবো ছোট ছোট পর্বত বা ডুবো দ্বীপ আছে। জাহাজ এলে এ সব পর্বতে ধাক্কা খেয়ে তলা ফেঁসে যায় এবং জাহাজ ডুবি হয়ে লোক মারা যায়। কাজেই এদিকে কোন জাহাজ ভুলক্রমেও আসে না।

কথাটা শুনে বনহুর শিউরে উঠেছিলো মনে মনে কিন্তু হুসনাকে এ কথা সে বলেনি কারণ সে হয়তো এ কথা শুনলে অত্যন্ত মুষড়ে পড়বে। বুঝতে পারবে কোন দিন আর সে ফিরে যেতে পারবে না তার বাবা মা বা আত্মীয় স্বজনের কাছে। বনহুর নিজেও হতাশ হয়ে পড়েছিলো। তবু সে একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে বসে থাকতো সকাল বিকাল সমুদ্রতীরে এছাড়া আর কিইবা করবার ছিলো তার।

প্রায় সপ্তাহ কেটে গেলো।

ক্রমেই হাঁপিয়ে উঠছে বনহুর।

হুসনাকে দেখলে কিন্তু তেমন ভাবাপন্ন মনে হয় না বরং সে দিন দিন আনন্দ মুখর হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে ভাবে হুসনা এমনি করে চিরদিন যদি মিঃ চৌধুরীকে সে নিজের পাশে পেতো তা হলে ধন্য হবে তার জীবন। পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ যেন এসে জড়ো হয়ে আছে মিঃ চৌধুরীর মধ্যে। ওর সান্নিধ্য হুসনার জীবনে এক পরম সম্পদ।

বনহুর বুঝতে পারে দিন দিন হুসনা তার দিকে আকর্ষিত হচ্ছে। তাকে নিবিড় করে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছে সে। যতই বনহুর এড়িয়ে চলুক

হুসনা তাকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে। অবশ্য এর জন্য দায়ী বনহুর নিজে নয়। ভাগ্য তাদের এভাবে উভয়কে কঠিন এক সমস্যার সম্মুখে এগিয়ে নিচ্ছে।

কাজ না করে সময় কাটে না।

বনহুর একদিন জেলেদের সঙ্গে জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। বুড়ো জেলে বা বুড়িমার কথা সে কানেও নিলোনা। বনহুর চায় নিজের মনকে সংযত রাখতে এবং কাজের মধ্যে মগ্ন থাকতে।

হুসনা তো অবাক, সে বলেই বসে—মিঃ চৌধুরী আপনি মাছ ধরতে পারবেন?

কেনো পারবো না। মানুষ যা পারে তা আমিও পারি। জালটা গুছিয়ে নিতে নিতে বললো বনহুর।

হুসনা বললো—আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলুন না?

অবাক হয়ে বলে বনহুর—আপনি যাবেন মাছ ধরতে?

হাঁ, ঐ তো জেলে মেয়েরা যাচ্ছে?

ওদের অভ্যাস আছে।

আমিও অভ্যাস করে নেবো।

তা হয় না আপনি এসব পারবেন না।

মিঃ চৌধুরী আপনি চলে গেলে কি করে একা থাকবো?

হাসলো বনহুর একটু ভেবে বললো—আপনি সমুদ্র তীরে ঝিনুক কুড়োতে থাকুন কেমন?

আচ্ছা।

বনহুর জেলেদের সঙ্গে চলে যায়।

হুসনা সমুদ্র তীরে বেলা ভূমিতে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে সম্মুখের দিকে। যতক্ষণ বনহুরকে দেখা যায় ততক্ষণ নির্নিমেশ দৃষ্টি নিয়ে দেখতে থাকে।

একদল জেলের মধ্যে বনহুর যেন অপরূপ এক পুরুষ। বনহুরের দেহে কোন জামা ছিলো না তাই ওকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

জেলেদের নৌকাগুলো দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই হুসনা সমুদ্র তীর বেয়ে অগ্রসর হলো। দেখতে পেলো সুন্দর সুন্দর ঝিনুক পড়ে আছে এখানে সেখানে। হুসনা ঝিনুকগুলো কুড়িয়ে আঁচলে জড়ো করতে লাগলো।

অল্পক্ষণে সে অনেক ঝিনুক সংগ্রহ করে ফেললো। এমন সময় জেলেদের একটি তরুণী এসে দাঁড়ালো তার সম্মুখে, বললো—কি করবি ও সব ঝিনুক দিয়ে?

হুসনা হেসে বললে—খেলা করবো।

কার সঙ্গে ? স্বামীর সঙ্গে বুঝি?

হুসনা চট করে জবাব দিতে পারলো না, সে মাথা নিচু করে রইলো।

তরুণীটি বললো—লজ্জা করছে না? আমরা কিন্তু স্বামীকে দেখে এতো লজ্জা করি না। আমার স্বামীকে তুই দেখেছিস?

না।

তোর স্বামীর মত এতো সুন্দর না—কালো। কিন্তু জানিস আমার স্বামী আমাকে খুব ভালবাসে। তোর স্বামী তোকে আদর করে না?

হুসনা ছোট্ট জরে জবাব দেয়—করে।

তোর নাম কি?

হুসনা।

আমার নাম চুমকি। আয় ঘরে যাই চল।

হুসনা আর চুমকি ফিরে চলে।

যেতে যেতে অনেক গল্প করে চুমকি—হুসনা শোনে। বলে চুমকি এই দেখ হুসনা আমার স্বামী আমাকে কত চুড়ি এনে দিয়েছে। জানিস এখানে মেলা হয়। মেলাতে অনেক কিছু পাওয়া যায়। মাথার ফিতা, চুড়ি, নাকের নোলক, দুল সব পাওয়া যায়। তুই তোর স্বামীকে বলিস মেলায় তোকে নিয়ে যাবে।

হুসনা শুধু শুনে যায় কোন কথা বলেনা। তবে বড় ভাল লাগে ওর কথাগুলো হুসনার। মনপ্রাণ দিয়ে ও অনুভব করে।

এক সময় ফিরে আসে জেলেরা।

উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতিক্ষা করছিলো হুসনা মিঃ চৌধুরীর।

ফিরে আসে বনহুর।

জেলেরা আজ অনেক মাছ পেয়েছে। খুশিতে ডগমগ সবাই। বুড়ো জেলে বললো—বাবুর বড় সাঁত আছে তাই আজ এতো মাছ পেয়েছি।

সবাই যখন মাছ ভাগ করা নিয়ে ব্যস্ত তখন বনহুর নিজের কুঠির মধ্যে এসে চীৎ হয়ে শুয়ে পড়ে দড়ির খাটিয়ায়। ক্লান্ত-অবশ দেহটা এলিয়ে দিয়ে দু'চোখ বন্ধ করে ভাবতে থাকে কত কথা। অবসর মুহূর্তে সিগারেট বনহুরের একমাত্র সাথী কিন্তু এ দেশে সিগারেট-বা ঐ ধরনের কিছু নেই। জেলেরা গাঁজা খায়, তাড়ি খায় নেশা করে এ সব তো আর বনহুরের জন্য নয়।

সিগারেট না পেলে বনহুরের মাথা ধরে এটা তার অভ্যাস কিন্তু না পেলেও সে একেবারে অস্থির বা ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়েনা।

বনহুর নির্জনে চোখ বন্ধ করে পড়েছিলো।

হুসনা এসে বসে তার শিয়রে কিছুক্ষণ এক নজরে তাকিয়ে থাকে সে তার মুখমন্ডলে। তারপর একটা হাত পাখা নিয়ে বাতাস করতে থাকে।

বনহুর বুঝতে পারে হুসনা ছাড়া কেউ নয়। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকায় শান্ত কণ্ঠে বলে মিস হুসনা আপনি আমার জন্য অনেক কষ্ট করেন কিন্তু আমি আপনার কিছু করতে পারলামনা।

হুসনা বলে উঠে—আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন আর বলছেন কিছু করতে পারেননি?

জীবন রক্ষা ঠিক আমি করেছি বলে মনে হয়না।

আপনি স্বীকার না করলেও আমি তো অস্বীকার করতে পারবোনা। আপনি যদি সেই মুহূর্তে আমাকে নিয়ে সাগর বক্ষে সাঁতার না দিতেন তাহলে কিছুতেই আজ পৃথিবীর আলো দেখতে পেতাম না। সেই ভীষণ

মুহূর্তের কথা কোন দিনই ভুলবোনা মিঃ চৌধুরী। চিরদিন স্মরণ থাকবে সেদিনের কথা।

এরপর থেকে প্রতিদিন বনহুর জেলেদের সঙ্গে মাছ ধরতে সমুদ্রে যেতো। হাঁপিয়ে উঠা মুহূর্তগুলো হারিয়ে যেতো কাজের মধ্যে কিন্তু যেদিন জেলেরা মাছ ধরতে যেতোনা সেদিন বড় খারাপ লাগতো। তবে সেদিনের সাথী ছিলো হুসনা। যদিও বনহুর হুসনাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতো তবু মাঝে মাঝে ওকে কাছে পাবার জন্য মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। কারণ সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতা তাকে অস্থির করে তুলতো।

সমুদ্রের ধারে বেলাভূমিতে বনহুর আর হুসনা বসে নানা গল্প করতো। হুসনা তার ছোটবেলার কাহিনী বলে শোনাতো। বনহুর সত্য গোপন করে যতটুকু বলা যায় বলতো ওর কাছে।

কখনও ওরা দু'জন মিলে ঝিনুক কুড়োতো, ছোট্ট ছেলে মেয়েদের মত খেলা করতো ওরা ঝিনুক নিয়ে। কোন সময় সমুদ্রের উচ্ছল ফেনিল ঢেউগুলোর মধ্যে ছু'টোছুটি করতো। একদিন হুসনা একটা বড় সুন্দর ঝিনুক দেখে বললো—মিঃ চৌধুরী দেখছেন কি সুন্দর একটা ঝিনুক, ওটা কে আগে নিতে পারে আপনি না আমি।

বেশ তাই হোক! বললো বনহুর তারপ, হুসনা আর বনহুর এক সঙ্গে দিলো দৌড়।

বনহুর আর হুসনা একসঙ্গে ধরে ফেললো ঝিনুকটা। দু'জন হেসে উঠলো ওরা খিলখিল করে।

হুসনা বললো—আমি আগে ধরেছি।

বনহুর বললো—আমি আগে ধরেছি।

এমন সময় চুমকি এসে দাঁড়ালো, সেও হাসছে। বললো—কি হয়েছে বাবু?

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো—দেখো চুমকি, ঝিনুকটা আমি আগে ধরেছি কিন্তু হুসনা স্বীকার করছে না ও বলছে আমি ধরেছি।:

হুসনা বললো—মিথ্যে কথা আমি ধরেছি।

বনহুর বললো—আচ্ছা এবার চুমকিকে স্বাক্ষী রেখে আমরা ঝিনুক ধরবো।

বেশ্ তাই হোক। হুসনা রাজি হয়ে গেলো।

চুমকি নিজে গিয়ে ঝিনুকটা বালির উপরে রেখে এলো, বললো—দেখবো তোরা কে আগে এটা ধরতে পারিস!

বনহুর তৈরি হয়ে দাঁড়ালো, হুসনাও মাজায় কাপড় জড়িয়ে নিলো ভাল করে।

চুমকি হাতে হালি দিলো একটা, দুটো , তিনটা। সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিলো বনহুর আর হুসনা।

এবার বনহুর আগে ধরে ফেললো ঝিনুকটা।

সঙ্গে সুঙ্গে হুসনাও ধরে ফেললো কিন্তু ঝিনুক নয় বনহুরের হাতখানাকে দু'হাতের মুঠায় চেপে ধরলো সে।

চুমকি খিল খিল করে হেসে উঠলো।

হুসনার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, হেরে যাওয়ার লজ্জায় সে ম্লান হয়ে পড়লো বিশেষ করে চুমকির সামনে।

বনহুরও হাসতে লাগলো।

হুসনার অভিমান হয়ে গেলো।

বনহুর বুঝতে পারলো হুসনা হেরে যাওয়ায় অভিমান করে বসেছে তাই সে এগিয়ে এসে হুসনার চিবুকটা তুলে ধরে বলে—নিন আর একবার হোক। চুমকী তুমি এবার ভাল করে দেখবে কেমন?

আচ্ছা বাবু।

বনহুর ঝিনুকটা ছুড়ে কিছু দূরে ফেলে দিয়ে বলে—নিন এবার কে আগে ঝিনুকটা হাতে তুলে নিতে পারে।

না আমি আর নেবো না।

রাগ করলেন?

না।

তবে?

আর নেবো না।

আর একবার।

যদি আমি জিতে যাই তাহলে কাল আপনি যখন মাছ ধরতে যাবেন আমাকে সঙ্গে নিতে হবে কিন্তু। যদি কথা দেন তাহলে রাজি আছি।

আচ্ছা কথা দিলাম। বললো বনহুর।

হুসনা চুমকীকে লক্ষ্য করে বললো—চুমকী তুমি সাক্ষী রইলে যদি জিতে যাই তাহলে কাল কিন্তু আমাকে মাছ ধরতে নিয়ে যাবে।

চুমকী বললো—হাঁ বাবু ঠিক তোকে নিয়ে যাবে। এবার সে হাতে তালি দিলো, একবার দু'বার, তিনবার।

সঙ্গে সঙ্গে ছুট দিলো হুসনা।

বনহুর একটু পিছিয়ে ধীরে দৌড় দিলো।

হুসনাকে জিতে দেওয়াটাই ছিলো বনহুরের মূল উদ্দেশ্য।

হুসনা খুশি হয়ে উঠলো।

এমনি করে নানা হাসি গল্পে এবং দৌড়াদৌড়িতে কাটতে লাগলো দিনগুলো। আজকাল হুসনাও যায় মাছ ধরতে জেলেদের সঙ্গে।

সমুদ্রে জাল নিয়ে মাছ ধরতে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠে হুসনা। সর্বক্ষণ হুসনা চায় মিঃ চৌধুরীকে তার কাছে কাছে রাখতে।

হুসনার তাই ছলনা কেমন করে মাছ ধরার মুহূর্তগুলোও সে মিঃ চৌধুরীর পাশে পাশে থাকতে পারবে এবং সে কারণেই কৌশলে হুসনা মিঃ চৌধুরীকে সেদিন শপথ করিয়ে নিয়েছে।

এখন সে ইচ্ছামত মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে সমুদ্রে যায়। মিঃ চৌধুরী তাকে বাধা দেয় না। ভোরে সূর্য উঠা দেখতে ভালবাসে হুসনা তাই সে রোজ খুব সকালে সমুদ্র তীরে গিয়ে বসে মিঃ চৌধুরীকে তার পাশে চাই।

বনহুর হুসনার আনন্দে বাধা দেয়না, সেও হাঁপিয়ে উঠা মুহূর্তগুলোকে ভুলে থাকতে চায়। মাঝে মাঝে মনটা বড় অস্থির হয়ে পড়ে, মনে পড়ে আস্তানার কথা, মনে পড়ে নূরী আর জাভেদের কথা, মনে পড়ে মনিরা আর

নূরের কথা। সব চেয়ে মায়ের মুখ খানা মনে পড়লে অসহ্য একটা ব্যথায় টনটন করে উঠে বুকটা।

তখন বনহুর গম্ভীর ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। নির্জনতার সন্ধানে একা একা গিয়ে বসে সমুদ্র তীরে। যেখানে সহসা কারো দৃষ্টি গিয়ে পড়বে না এমন এক জায়গায় বসে তাকিয়ে থাকে সমুদ্রের দিকে।

আকাশের নীল আর সমুদ্রের নীল যেখানে মিশে এক হয়ে গেছে সেখানে স্থির হয় তার দৃষ্টি। কতদিন আর সে এমনি এক নিষ্ঠুর বন্দী জীবন কাটাবে। আকাশে অসংখ্য বলাকা ডানা মেলে ফিরে যাচ্ছে নিজ নিজ নীড়ে কিন্তু সে ফিরে যাবে কোথায়? জেলেরা তাকে আশ্রয় দিয়েছে তাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, স্নেহ করে জেলে বুড়ো জেলে বুড়ি মা। যা খাচ্ছে মোটামুটি মন্দ নয়। প্রচুর ফল না খেলেও প্রচুর দুধ সে পাচ্ছে। কিন্তু এমনি করে কতদিন কাটবে। দু'মাস কেটে গেছে। হুসনা আর জেলেদের নিয়ে সে এতোগুলো দিন কাটিয়ে দিয়েছে। কতদিন হুসনাকে পাশে পেয়ে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে হয়তো বা পুরুষ সুলভ স্বভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার মুধ্যে তবু সে বিচলিত বা অসংযত কিছু ঘটিয়ে বসেনি।

কঠিন এক সংযম বন্ধনে নিজকে আটকে রেখেছে। পাশাপাশি দু'টো খাটিয়ায় ঘুমাতো ওরা একই কুঠিরে। জেলেরা জানতো ওরা দু'জন বর-বৌ তাই ওদের মধ্যে তাদের নিয়ে কোন চিন্তার কারণ ছিলোনা। বরং ওদের নিয়ে জেলে জেলেনীদের মধ্যে খুশির উচ্ছাস বইত। প্রায়ই জেলেদের পাড়ায় উৎসব হতো।

বনহুর আর হুসনাকে কেন্দ্র করে জেলে জেলেনীরা নাচ গান তামাসা করতো।

পূর্ণিমা রাতে ওদের সব চেয়ে বড় আনন্দ-উৎসব হতো। গত পূর্ণিমা রাতে অনেক সময় ধরে নাচ-গাচ চলেছিলো। তারপর চলেছিলো ভোজনের পালা। জেলে বুড়ির আদেশক্রমে জেলে তরুণীরা হুসনা আর বনহুরকে

নিজেদের পোশাকে সাজিয়ে দিয়েছিলো। যদিও বনহুর প্রথমে রাজি হচ্ছিলোনা তবু ওরা জোরপূর্বক রাজি করিয়ে ছাড়লো সেদিন। তরুণীরা হুসনা আর বনহুরকে নিয়ে রং মাখামাখি করলো তারপর দু'জনাকে বাসর ঘরে দেবার মত করে পৌঁছে দিয়ে গেলো কুঠিরটার মধ্যে।

কুঠিরে প্রবেশ করে গলা থেকে ফুলের মালাগুলো খুলে দড়ির খাটিয়ার এক পাশে রেখে বলে উঠে—হুসনা এ সবের জন্য আমাকে যেন ভুল বুঝোনা।

হুসনার মুখে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠেছিলো তখন। কোন জবাব সে দিতে পারেনি কারণ এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তাঁদের দু'জনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঘটেছে। যদিও তারা কোন আপত্তি করেনি। করলেও ওরা তা শুনতোনা এ কথা জানে হুসনা এবং বনহুর।

বনহুর মালাগুলো রেখেই দেহটা এলিয়ে দিয়েছিলো খাটিয়ায়। হুসনাও তার বিছানায় শুয়ে পড়েছিলো। রাত গভীর হওয়ায় বেশিক্ষণ হুসনা জেগে থাকতে পারেনি সেদিন।

বনহুর কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘুমাতে চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারেনি। বেড়ার ফাঁকে আকাশের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছিলো সেদিকে তাকিয়ে ভাবছিলো নানা কথা। জোছনার আলোতে উজ্জল চারিদিক। আকাশে অসংখ্য তারার প্রদীপ আজ নিপ্রভ। চাঁদের আলোতে তারাগুলোকে প্রাণহীন মনে হচ্ছে।

রাত কত হয়েছে বুঝবার কোন উপায় নেই। কারণ এ দ্বীপে আসার পর ঘড়ির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার। তাই সময় তাকে আন্দাজে নির্ণয় করে নিতে হয়। বনহুর বুঝতে পারে রাত দুঁটো কিংবা তিনটে হবে। সমুদ্রের ক্ষীণ গর্জন শোনা যাচ্ছে। অজস্র ঢেউ এসে আচড়ে পড়ছে বালু চরে এ হয়তো তারই শব্দ।

এ পাশ ও পাশ করে বনহুর। পাশ ফিরতেই দৃষ্টি গিয়ে পড়ে হুসনার এলায়িত দেহটার উপর। বেড়ার ফাঁকে জোছনার খানিকটা আলো ছড়িয়ে

পড়েছে তার দেহে। সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারেনা বনহুর। অপূর্ব লাগছে ওকে আজ। হুসনার গলায় এখনও ফুলের মালাগুলো জড়িয়ে আছে। কপালে চন্দনের ফোটা। চুলগুলো ছড়িয়ে আছে বালিশে বিছানার বুকে। বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়, এগিয়ে আসে বনহুর ধীর মন্থর পদক্ষেপে হুসনার বিছানার পাশে। একটা দুর্দ্দমনীয় লোভাতুর আকাঙ্খা তাকে চঞ্চল করে তোলে।

একেবারে বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বনহুর। দৃষ্টি তার হুসনার মুখে সীমাবদ্ধ। জোছনার আলোতে ওর মুখখানা লোভনীয় হয়ে উঠেছে।

বনহুরের মুখটা ধীরে ধীরে ঝুকে আসে হুসনার মুখখানার দিকে কিন্তু হঠাৎ বিবেক তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, না না তা হয়না। হুসনা তার আশ্রিতা, অসহায় তরুণী। জলদস্যু তাকে নিষ্পেষিত লাঞ্চিত করেছে, হরণ করেছে তার সতীত্ব কিন্তু সে তো ঐ জলদস্যুর মত নরপশু নয়। তা হয় না—তা হয় না...

বনহুর কুঠির ত্যাগ করে বেরিয়ে গিয়েছিলো সেদিন বাইরে। হুসনা বা জেলেরা কেউ জানেনা। জানে শুধু আকাশের অসংখ্য তারা জানে ঐ পূর্ণিমার চাঁদ, জানে আকাশ বাতাস আর সমুদ্র। বনহুর কুঠির ত্যাগ করে এসে বসেছিলো নির্জন সমুদ্র তীরে। মনকে শান্ত সংযত করার জন্য নিজের চুলগুলোতে বার বার আংগুল চালাতে লাগলো।

সমুদ্র তীরের হীমেল হাওয়া তাকে আলিঙ্গন জানালো। জোছনার আলো তাকে বরণ করে নিলো। অসংখ্য তারকা তাকে অভিনন্দন জানালো, সমুদ্রের ঢেউগুলো এসে লুটোপুটি খেতে লাগলো তার পায়ের তলায়। সমীরণে কে যেন কানে কানে বললো...বনহুর তুমি মানুষ নও তুমি অসাধারণ মানুষ...

আজও বনহুর নির্জন সমুদ্র তীরে বসে বসে ভাবছিলো, এমন করে আর কতদিন কাটবে। কতদিন তাকে এ দ্বীপে বন্দী অবস্থায় থাকতে হবে। হুসনা যেন দিন দিন গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছে তার সঙ্গে। যতই ওকে দূরে

সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে ততই যেন সে তাকে আঁকড়ে ধরার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর শেষ হবে কবে কখন কোন মুহূর্তে।

হঠাৎ হাসির শব্দ।

পিছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পায় হুসনা অদূরে দাঁড়িয়ে। হাসছে। বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে সে—আপনি এখানে আর আমি খুঁজে ফিরছি আপনাকে...

হেসে বলে বনহুর—আমিও এখানে আপনার প্রতিক্ষায় বসে আছি।

সত্যি?

হাঁ সত্যি। আসুন আমার পাশে।

হুসনা এসে বসে বনহুরের পাশে। উচ্ছল তার মুখভাব বলে হুসনা এখানে নির্জনে বসে কি ভাবছিলেন?

যদি বলি আপনি বলুন তো কি ভাবছিলাম?

বলবো?

হাঁ বলুন?

কেমন করে আমার কাছ থেকে আপনি পালিয়ে বাঁচবেন তাই ভাবছিলেন। কথাগুলো বলবার সময় হুসনার মুখখানা ম্লান নিষ্প্রভ মনে হলো।

বনহুর প্রথমে বিস্মিত হলো কারণ হুসনা যা বলেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। হুসনার কাছ থেকে তার এ আত্মগোপন নিশ্চয়ই ধরা পড়ে গেছে ওর কাছে। বলে বনহুর—মিস হুসনা আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা নয় কারণ আমি দিন দিন আপনার সান্নিধ্যে জড়িয়ে পড়ছি তাই সরে থাকতে চাই...

মিঃ চৌধুরী আমি জানি আপনি আমাকে কেনো এমন ঘৃণা করেন?

ঘৃণা?

হাঁ ঘৃণা করেন বলেই তো আপনি আমাকে এমনভাবে সরিয়ে দিতে চান। মিঃ চৌধুরী আমি জানি আমি অপবিত্র কলঙ্কিত তাই আমি সাহস

করিনি বা করিনা আপনাকে কোনদিন পাবো। আপনি বলেছিলেন যা ঘটে গেছে তা আপনার ইচ্ছাকৃত নয়। তবু কেনো—কেনো আপনি আমাকে এভাবে ঘৃণা করেন।

মিস হুসনা আমি ঘৃণা করি এ কথা কে বললো? বিশ্বাস করুণ আমি আপনাকে একটি ফুলের মতই পবিত্র মনে করি।

তবে কেনো—কেনো আপনি আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চান? কেনো আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ান বলুন তো?

মিস হুসনা আপনাকে ভালবাসি বলেই তো আমি...

ঠিক্ ঐ মুহূর্তে একটা তীর এসে বিদ্ধ হলো বনহুরের বাম হাতের বাজুতে। বনহুর আর্তকণ্ঠে বলে উঠে—উঃ...সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়ে তীরখানা তুলে ফেলে একটানে। সুন্দর মুখমন্ডলে একটা দারুণ যন্ত্রনার চিহ্ন ফুটে উঠে বলে বনহুর—মিস হুসনা শীঘ্র পালান...জেলে বাবাকে খবর দিন...বিষাক্ত তীর বিদ্ধ হয়েছে আমার দেহে...বনহুর ঢলে পড়ে।

হুসনা ওকে দু'হাতে কোলের মধ্যে টেনে নেয়, ব্যাকুল এবং ব্যস্ত কণ্ঠে ডাকে—মিঃ চৌধুরী একি হলো আপনার? কিন্তু কোন জবাব সে পেলোনা।

হুসনা তাড়াতাড়ি বনহুরকে বালির উপর শুইয়ে দিয়ে ছুটতে লাগলো জেলে বাবার উদ্দেশ্যে।